গ্রিগোরী বনদারেভস্কী

মুসলিম জনগণের শত্রুর স্বরূপ

একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

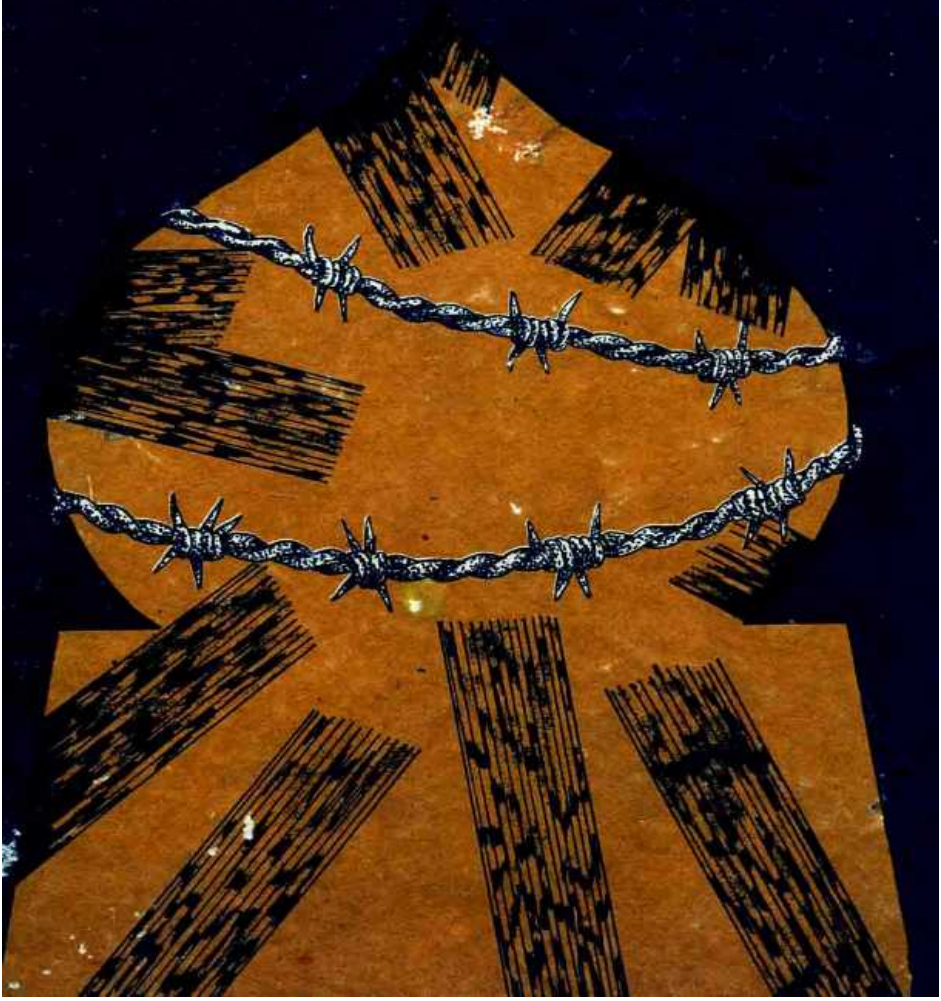

ভূমিকা

চলতি শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষের দিকে আফগানিস্তান ও ইরানের বিপ্লব, পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণতান্ত্রিক প্রবণতার তীব্রতা বৃদ্ধি এবং জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান মর্যাদা মুসলিম প্রাচ্যের দেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাকে যথেষ্ট খাটো করেছে। এবং এই পরিস্থিতিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলোর শাসকচক্র, তাদের ভাষায় "দ্বৈত কৌশল" অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের "মুসলমান সম্পর্কিত নীতি" কিছুটা সংশোধন করেছে।

একদিকে, এসব দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এ অঞ্চলে তাদের কর্মতৎপরতা জোরদার করেছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সি. আই. এ) ভেতরে তড়িঘড়ি একটা বিশেষ মুসলিম বিভাগ খুলে ফেলেছে। তারা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর সীমান্ত ধরে তাদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলছে। ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরে তারা সমরসজ্জার গতি বাড়িয়েছে এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিরোধ সৃষ্টিতে আরো সক্রিয়ভাবে উস্কানী দেয়া শুরু করেছে।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি তাদের "শতাব্দী প্রাচীন" শ্রদ্ধার কথা, মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মীতার কথা খুব জোরেশোরে প্রচার করা শুরু করেছে। এটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ১৯৭৯-৮০ সালে। ঐ বছরে মুসলিম বিশ্ব বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনা উৎসব পালন করে। ঐ সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও রোনাল্ড রেগান, তাঁদের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী, মার্কিন সিনেটর ও ইতিহাসবিদগণ, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর মন্ত্রী, পার্লামেন্ট সদস্য ও বুদ্ধিজীবীগণ এ প্রসঙ্গে অনেক বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তাঁরা সবাই তাঁদের বিবৃতি

ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিশ্বের ৮০ কোটি মুসলমানকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর থেকেই পাশ্চাত্যের দেশগুলো মুসলমানদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক, পারস্পরিক সমঝোতা, মৈত্রী ও সহযোগিতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে আসছে।

তবে পাশ্চাত্যের দেশগুলো শুধু মুখেই "ইসলামপ্রীতির" ভাব দেখাচ্ছে। এটা যে নিছক ভন্ডামী সেটা ধরা পড়ে যায় পাশ্চাত্যের দেশগুলোর গোয়েন্দারা শাদ, ইথিওপিয়া ও ফিলিপাইনের মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে, ভারতের মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে, শ্রীলংকার মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে, মধ্যপ্রাচ্য, সিরিয়া, ইরাক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ যেভাবে উস্কে দিচ্ছে বা জিইয়ে রাখছে তার ভেতর দিয়ে। মার্কিন শাসকচক্রের নীরব সমর্থন ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের যোগসাজশে ইহুদীবাদী আগ্রাসক ও তার দোসর ফ্যালাঞ্জিস্ট বাহিনী কর্তৃক ১৯৮২ সালে লেবাননে সংঘটিত হত্যাকান্ড পাশ্চাত্যের "ইসলামপ্রীতির" প্রকৃত মূল্য কতটুকু সেটাই তুলে ধরে। লেবাননে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপও, যার ফলে হাজার হাজার মুসলমান প্রাণ হারায়, এই একই কথা প্রমাণ করে।

ঐতিহাসিক তথ্য এবং ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মোহাফেজখানায় প্রাপ্ত অসংখ্য দলিলপত্রের ভিত্তিতে এই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। আমি মনে করি, এই পুস্তকে সন্নিবেশিত তথ্য-প্রমাণাদি পাশ্চাত্যের বহু রাষ্ট্রনায়ক ও জননেতার এই বক্তব্যকে সন্দেহাতীতভাবে খন্ডন করবে যে, তাঁদের দেশগুলো বিগত প্রায় ১৫০০ বছর ধরে মুসলিম জাতিসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে এসেছে।

তবে প্রকৃত প্রস্তাবে, ক্রুসেডের পর থেকে পশ্চিমা শক্তি, অর্থাৎ তাদের প্রথম সারির রাষ্ট্রনায়ক, কূটনীতিক, জেনারেল, বণিক সম্প্রদায়, মিশনারী ও ঔপনিবেশিক প্রশাসকগণ মুসলমানদের পদানত করার জন্যে, তাদের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠন ও প্রাচীন সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্যে বারবার সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছে, ধ্বংসাত্মক ও হস্তক্ষেপমূলক কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, জাতিগত, গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় ও আন্তঃরাষ্ট্র কলহ উস্কে দিয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রতিরক্ষা সামর্থ্য এবং মুসলিম জাতিসমূহের জাতীয় চেতনা যেহেতু ইসলাম ধর্মের সাথে

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাই পশ্চিমা "ইসলামপ্রীতি" সর্বাগ্রে ইসলাম ধর্মের কর্তৃত্ব ও প্রভাবকে খাটো করার চেষ্টা করে এসেছে।

উপনিবেশবাদীরা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা, ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধন এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা প্রভৃতি ভন্ডামীপূর্ণ ও বাগাড়ম্বরসর্বস্ব শ্লোগানের আড়ালে তাদের লুন্ঠনাত্মক ও আগ্রাসী পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য গোপন রাখে। এখানে এটা স্মরণ করাই যথেষ্ট হবে যে প্রায় ৯০০ বছর আগে ফ্রান্স, ইটালী, ইংল্যান্ড ও জার্মানীর সামন্ত প্রভুরা মুসলমানদের কবল থেকে জেরুজালেম ও হলি সেপুলচার (পবিত্র সমাধি) পুনরুদ্ধারের নামে মিসর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও লেবাননের জাতিসমূহের বিরুদ্ধে আগ্রাসন পরিচালনা করে, যদিও তাদের এ আগ্রাসনের আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন এই অঞ্চলের মূল এলাকা দখল করা, সম্পদ লুন্ঠন করা এবং ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। পোপ স্বয়ং ঐ যুদ্ধবিগ্রহকে উৎসাহিত করেছেন। ক্রুসেডারগণের ইউনিফর্মে ক্রুশ-চিহ্ন আঁটা থাকতো। বহু দেশের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইয়ে ঐ যুদ্ধবিগ্রহকে এখনো ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড) বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

বড় ধরনের ক্রুসেড হয় আটটি। প্রথম ক্রুসেডে (১০৯৬-১০৯৯) ১ লক্ষেরও বেশী খ্রীষ্টান হানাদার বাহিনী প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডানের অংশবিশেষ, আজকের লেবাননের এক উল্লেখযোগ্য অংশ, সিরিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্ক দখল করে নেয়।

ঐ লুন্ঠনাত্মক অভিযানে ক্রুসেডারগণ নারী, শিশু ও বৃদ্ধ সহ হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। ১০৯৯ সালে জেরুজালেম দখলের সময় তারা এক নৃশংস হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। ফরাসীদের ক্রনিকলে (ঘটনাপঞ্জীর দলিল) দেখা যায়, মুসলমান যোদ্ধারা হজরত ওমর (রাঃ) স্থাপিত মসজিদ রক্ষার জন্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। ক্রনিকল সংকলক লিখছেন, ক্রুসেডারগণ মসজিদের মধ্যে ঢুকে পড়ার পর "মসজিদটি মুসলমানদের রক্তে ভেসে যায়।" তিনি আরো জানিয়েছেন, জেরুজালেমের মুসলমানদের মৃতদেহ তারপর যখন একের পর এক জড়ো করে স্তুপ করা হয় তখন তার কোনো কোনোটি নগরের দালান কোঠার উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যায়। সবশেষে ক্রনিকল সংকলক স্বীকার করেছেন ঃ

"এর আগে প্রাচ্য এতোবড়ো রক্তাক্ত গণহত্যা আর কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি বা এতোবড়ো গণহত্যার কথা শোনেও নি।"

ক্রুসেডাররা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের বহু বর্ধিষ্ণু শহর ধ্বংস করে এবং ঐসব শহরের মুসলিম অধিবাসীদের এক বিরাট অংশকে হত্যা করে। প্যালেস্টাইন, লেবানন ও সিরিয়ার পশ্চিমাংশের কৃষকদের তারা দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে এবং তাদের ওপর বিপুল পরিমাণ করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এর ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মনে হানাদারদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জাগ্রত হয় এবং তা পূর্ব-সিরিয়া ও মিশরের শাসকদের ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিসর, পশ্চিম ইরাক ও লেবাননের মুসলমানরা সালাহউদ্দিনের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়। আর এর ফলে তারা ১১৮৭ সালের ৩রা ও ৪ঠা জুলাই তারিখে টাইবেরিয়াস হ্রদের উপকূলবর্তী হাত্তিন শৃঙ্গে সংঘঠিত যুদ্ধে ক্রুসে-ডারদের পরাজিত করে জেরুজালেম, প্যালেস্টাইন, সিরিয়ার এক বিরাট অংশ ও লেবানন পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

এই বিজয়, আমার মনে হয়, আরব প্রাচ্যের জাতিসমূহের সামনে এটাই তুলে ধরে যে কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেই আগ্রাসনকে তার সমু-চিত শিক্ষা দেয়া সম্ভব।

ভ্যাটিকান এবং পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত প্রভুরা বার বার ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব-উপকূলীয় মুসলিম দেশসমূহ জয় করার এবং সেখানে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত দ্বিতীয় ক্রুসেডে হেরে গিয়ে ১১৮৭ সালে পোপ অষ্টম গ্রিগরী খ্রীষ্টানদের প্রতি তৃতীয় ক্রুসেডের জন্য তৈরী হওয়ার আহবান জানান। এই বিশাল অভিযান শুরু হয় ১১৮৯ সালে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের রাজার এবং সম্রাট ফ্রিডরিখ বারবারোসার নেতৃত্বাধীন জার্মানীর শাসক মহলের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনী এই ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তৃতীয় ক্রুসেডও ব্যর্থ হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডাররা আবারো চেষ্টা করে তাদের হৃত অবস্থান পুনরুদ্ধারের। এই সময়ে, সালাহউদ্দীনের পরবর্তী মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী কলহের সুযোগে, তারা বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি জায়গায় জয়লাভ করে। ১২৭০ সালে সংঘঠিত অষ্টম ক্রুসেডও ব্যর্থ হয়। প্যালেস্টাইনে ক্রুসেডারদের সর্বশেষ দুর্গ, আক্কা দুর্গের পতন ঘটে ১২৯১ সালে। তারপর ছয়-সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে ভূমধ্য-

সাগরের পূর্ব উপকূলের মুসলমানরা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের জোয়াল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

ক্রুসেডাররা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের এক অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান বিদেশী হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা প্রত্যক্ষ করেন, ক্রুসেডারদের হাতে নির্যাতনের শিকারে পরিণত হন। প্রখ্যাত রুশ গণতন্ত্রী, লেখক ও সাহিত্য সমালোচক ভিসারিও বেলিনস্কি (১৮১১—১৮৪৮) ক্রুসেডারদের বর্ণনা করেছেন "অজ্ঞ, স্বার্থপর, নীচ, ধর্ম-বিদ্বেষী, গোঁড়া ও জঙ্গলী" বলে।

এমনকি এখনো পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদগণ ক্রুসেডারদের "ধর্মীয় ভাবাবেগের" ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম ও হলি সেপুলচার পুনরুদ্ধার করার "ধর্মীয় ভাবাবেগই" তাদের ক্রুসেডে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেন। এমনকি, ১৯৭০ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত "কেমব্রিজ হিস্টরী অব ইসলাম"-এর মতো দায়িত্বশীল পুস্তকেও মুসলিম প্রাচ্যের জাতিসমূহের ওপর ক্রুসেডের প্রতিকূল পরিণতিকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসকে বিকৃত করতে পারদর্শী পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদগণ দাবি করেন যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে স্থানীয় খ্রীষ্টানদের, বিশেষ করে লেবাননের ম্যারোনাইটদের সমর্থন ছিল। এই ভাষ্যকে ইদানিং মার্কিন ও ইহুদীবাদী প্রচারবিদরা লেবাননকে "মুসলিম" লেবানন ও খ্রীষ্টান (ম্যারোনাইট) লেবানন—এই দুইভাগে বিভক্ত করার "তত্ত্বগত" বনিয়াদ হিসেবে চালানোর জন্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ এ প্রশ্নে কিন্তু ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূলের মুসলিম দেশসমূহের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে বিপুল ক্ষতি করেছে ক্রুসেড তাঁরা তার বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত আরব ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ হুসেন-আলাও সম্প্রতি এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মুসলিম জাতিসমূহের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ভৌগোলিক আবিষ্কারের স্বর্ণযুগে। এই পর্যায়টা চলে মধ্য-পঞ্চদশ শতক থেকে মধ্য-ষোড়শ শতক পর্যন্ত, প্রায় ১০০ বছর ধরে। ঐ সময়কালের প্রধান প্রধান ঘটনার অন্যতম হলো ক্রিস্টোফার কলম্বাস কর্তৃক ১৯৪২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ১৪৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে পশ্চিম ইউরোপ থেকে ভারতে যাবার

সমুদ্রপথ আবিষ্কার, এবং ১৫১৯ সালে ফার্ডিনান্ড মাগেল্লান কর্তৃক সামুদ্রিক অভিযানে বিশ্ব পরিক্রমা।

এই সব সামুদ্রিক অভিযানের পেছনে প্রধান কারণ ছিল পশ্চিম ইউরোপের শাসক মহল ও বণিক পুঁজি কর্তৃক প্রাচ্যের মসলা ও অন্যান্য পণ্যের বাণিজ্যের ওপর এবং মূল্যবান খনিজ ধাতু সংগ্রহের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। মালাক্কা, দক্ষিণ ভারত, পারস্য উপসাগর ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার মুসলমানগণ বেশ কয়েক শ' বছর ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তার ওপর এসব অভিযান এক মারাত্মক আঘাত হানে। ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলো ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের সূচনা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর শাসকচক্র কর্তৃক এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার জাতিসমূহের ওপর ঔপনিবেশিক নির্যাতন চাপিয়ে দেয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত ছিল। চারশ' বছর আগের ক্রুসেডারদের মতো, ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ও নাবিকরাও তাদের লুণ্ঠনাত্মক পরিকল্পনাকে ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসারের শ্লোগানের পেছনে আড়াল করে রেখেছিল। ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের স্থপতি এডমিরাল আফোনসো দ্য আলবুকারেক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, হিন্দুস্তান ও পূর্ব-আফ্রিকা থেকে মক্কায় যাতায়াতকারী তীর্থযাত্রীদের সকল জাহাজ আক্রমণ করার নির্দেশ জারী করেন। তীর্থযাত্রীদের জাহাজ আক্রমণ করার পর আটককৃত মুসলমানদের সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে অথবা আগুনে পুড়িয়ে অথবা ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতো।

সম্রাট প্রথম এমানুয়েলকে লেখা এডমিরাল আফোনসো দ্য আলবুকারেকের একটা চিঠি এই লেখক উদ্ধার করেছে। ঐ চিঠিতে রাজার কাছে অতিদ্রুত মদিনা দখল ও হজরত মোহাম্মদের (সঃ) মাযার থেকে তাঁর পবিত্র শবদেহ উত্তোলন করে লিসবনে প্রেরণের জন্য জাহাজের গোলন্দাজ বাহিনীর (তখনকার দিনের একটি নতুন যুদ্ধাস্ত্র) ছত্রছায়ায় ইয়েনবোতে সৈন্য অবতরণের প্রস্তাব করা হয়। ঐ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র শবদেহের বিনিময়ে হলি সেপুলচার, জেরুজালেম ও মধ্যপ্রাচ্যের আরো কয়েকটি অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা।

যাই হোক, পর্তুগীজরা তাদের ঐ অভিযানে ব্যর্থ হয়। তবে, পূর্ব আফ্রিকা, পারস্য উপসাগরীয় উপকূল, হিন্দুস্তানের পশ্চিম উপকূল ও

মালাক্কার অধিকাংশ শহর ও নগরের মসজিদ তারা ধ্বংস করে ফেলে। পর্তুগালের ক্যাথলিক বিশপ এশিয়ার মুসলমানদের ওপর খ্রীষ্টান ধর্ম জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করতে উঠে-পড়ে লাগেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তদশ শতকে ফরাসী, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ ভাগ্যান্বেষী ও উপনিবেশ স্থপতিরা পূর্ব আফ্রিকা, ভারত মহাসগর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আবির্ভূত হয়। তারা শুধু খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসারের অজুহাতেই নয়, দাস বাণিজ্য রোধের নামেও মুসলমানদের বর্ধিষ্ণু নগর ও জনপদ দখল করে, ঐসব নগর ও জনপদের অধিবাসীদের হত্যা করে, মুসলিম রাজ্যগুলোকে লুণ্ঠন করে ও তাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে। এমনকি এখনকার স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও পাশ্চাত্যের ঐ সব লুটেরা, উপনিবেশবাদী ও দাসব্যবসায়ীদের রক্তলোলুপ কার্যকলাপকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সহজাত অনুষঙ্গ হিসেবে চালানো হয়ে থাকে। এমনকি আজও পাশ্চাত্যের লেখকরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের, এবং প্রাচ্যেরও, পাঠকদের বোঝাতে চান যে, মুসলিম জাতিসমূহের ওপর উপনিবেশবাদী লুণ্ঠন, তাদের দাসত্ব শৃংখল, অমানবিক শোষণ ইত্যাদি এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের জন্য মঙ্গলকর হয়েছে, কেননা এর মাধ্যমেই তারা লাভ করেছে প্রাগ্রসর বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও সভ্যতার সুযোগ। যদিও, উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না, মুসলমানদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া অসম ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে পশ্চিমা বণিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা হিসেবে লুটে নিয়ে গেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে মুসলিম প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের মান ইউরোপের তুলনায় অনেক উঁচু ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য, প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ভাসিলি বারতোল্দ (১৮৬৯-১৯৩০) তাঁর মূল থিসিস "মুসলিম সংস্কৃতি"-তে এই বক্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন। এই সোভিয়েত গবেষক উল্লেখ করেছেন যে মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খোওয়ারিজমি-র (অষ্টম ও নবম শতক) মতো গুণী বিজ্ঞানীদের রচনাবলী সারা মানবজাতির জন্যেই ছিল বিপুলভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অংক ও বীজগণিত বিষয়ক তাঁর রচনাবলী বিজ্ঞানের ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে। ইউরোপে তিনি পরিচিত ছিলেন এ্যালগরিদম নামে—এটা তাঁর মূল আরবী নামের লাতিনীয় প্রকারভেদ। আধুনিক অংক শাস্ত্রে ও সাইবারনেটিক্সে বহুল

ব্যবহৃত দুটি শব্দ "লগারিদম" ও 'আলগরিদম"-এর উৎপত্তি তাঁর নাম থেকেই। মধ্যযুগের প্রখ্যাত দর্শনিক কবি, চিকিৎসাবিদ ও বিশ্বকোষ প্রণেতা আবু আলী আল হুসাইন ইবনে সিনা (আভিসেনা), প্রখ্যাত অংকশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবু আল রায়হান আল বিরুনী, অংকশাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ আল ফারাবী, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ ইবনে রুশদ এবং ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম, সাদী, হাফিজ, নিজামী, জামী, নাভোই ও বাবরের মতো প্রখ্যাত কবি ও লেখকদেরকে ভাসিলি বারতোল্দ এবং মুসলিম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু বিজ্ঞানী ও গবেষক বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ আসন দিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহ যথার্থই গর্ব অনুভব করে যে এইসব প্রবাদতুল্য বিজ্ঞানীদের অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোভিয়েত মধ্য এশিয়া ও ট্রান্সককেশিয়ায়।

এক কথায়, উপনিবেশবাদের প্রবক্তারা যখন দাবি করে যে ভাস্কো ডা গামা ও আলবুকারেকের নেতৃত্বাধীন জলদস্যুরা, ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাড়াটে সৈন্যরা—যারা মধ্য-প্রাচ্য, হিন্দুস্তান, পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বর্ধিষ্ণু নগর ও বন্দরগুলোকে রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে—মুসলিম প্রাচ্যের জনগণকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সভ্যতা দিয়েছে তখন সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য শোনায়। আধুনিক বিজ্ঞান পশ্চিমা গবেষকদের এই দাবিও প্রত্যাখ্যান করে যে ভাস্কো ডা গামাই প্রথম ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারতে যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেছিলেন। সোভিয়েত আরব বিশারদ ত. আ. শুমোভস্কি তাঁর "আরব জাতি ও সমুদ্র" শীর্ষক বইয়ে প্রমাণ করেছেন, ভাস্কো ডা গামার জাহাজ শেষ পর্যন্ত পূর্ব আফ্রিকা থেকে ভারতে পৌঁছুতে পেরেছিল শুধু এই কারণে যে ঐ জাহাজের পথপ্রদর্শক ছিলেন আরব নাবিক আহমদ ইবনে মজিদ। শুমোভস্কি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমির প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক ইন্সটিটিউটের পান্ডুলিপি বিভাগের মোহাফেজ-খানায় আহমদ ইবনে মজিদের নিজের হাতের লেখা একটি "হ্যান্ডবুক" আবিষ্কার করেন। ঐ "হ্যান্ডবুকে" লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে নৌ-চলাচলের সব খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ আছে নাবিকদের ব্যবহারের জন্যে। উল্লেখ্য যে, ঐ হ্যান্ডবুকের শেষের দিকে তিনি তিক্ততার সাথে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে তিনি পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভারতে যাবার সমুদ্রপথ চিনিয়ে দিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ "আবিষ্কারক-গণ" ও "বণিকরা" (নাকি হানাদার !) এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে আবির্ভূত হয় পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপনকারীদের পরপর।

পৃথিবীর বৃহত্তম ও রক্তাক্ত জেলখানার নামান্তর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থপতি ব্রিটিশ আগ্রাসকরা মুসলিম জাতিসমূহের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে। তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন তিনটি আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং আফগানিস্তানের পূর্ব অংশ দখল করে নেয়। তারা ইরানের বিরুদ্ধে লুণ্ঠনাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করে, বালুচী জাতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে ফেলে, ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে এবং তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধে ইন্ধন জোগায়, খুজিস্তানকে ইরান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে, এবং বহু আরব দেশকে কয়েক শ' বছরের মতো জোরপূর্বক পানত করে রাখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনের ওপর প্রটেক্টরেট ক্ষমতা লাভ করে ব্রিটিশ শাসক চক্র সেখানে "ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি" গঠনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে। সারা বিশ্বের ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসবাস করতে উৎসাহ জুগিয়ে তারা ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের অবস্থা সৃষ্টি করে। যার দুঃখজনক পরিণতি আজ ভোগ করছে আরব প্রাচ্যের জাতিসমূহ।

ফরাসী আক্রমণকারীরাও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের তুলনায় পিছিয়ে থাকার পাত্র ছিল না। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো ও আফ্রিকার আরো কয়েকটি মুসলিম দেশকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে। তারা সিরিয়া ও লেবাননের মুসলমানদের এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্যারিসের ব্যাংকাররা তাদের অর্থনীতিকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলে। ১৮৩০ সালের পর থেকে ফরাসী উপনিবেশবাদীরা লেবাননের সামন্তবাদী ম্যারোনাইট গ্রুপকে সম্ভাব্য সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা দিতে থাকে। মুসলমানদের হয়রানির হাত থেকে খৃষ্টানদের রক্ষা করার অজুহাতে ১৮৬০-১৮৬১ সালে ফরাসী সেনাবাহিনী বৈরুত ও তার আশেপাশের এলাকা দখল করে নেয়। ফরাসী উপনিবেশবাদীদের চাপে পড়ে অটোমান সাম্রাজ্যের শাসকরা লেবাননকে দুইটি প্রদেশে (কায়মাকামস), দ্রুজ ও ম্যারোনাইট এলাকায় বিভক্ত করে। লেভান্তের আরবদের জাতীয় সচেতনতার বিকাশকে রোধ করে দেশটিকে ফরাসীদের

অধীনে রাখার উদ্দেশ্যে ধর্মের ভিত্তিতে লেবাননকে দ্বিখন্ডিত করা হলো। আজও "ভাগ করো ও শাসন করো", এই ঔপনিবেশবাদী নীতির দুঃখজনক পরিণতি ভোগ করে চলছে লেবাননের নাগরিকরা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা তুরস্কের রক্ত-লোলুপ শাসক, কোটি কোটি আরবের স্বাধীনতা হরণকারী সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে সমর্থন প্রদান করে। এটা করার মধ্য দিয়ে তারা মুসলিম জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন করার কাজকেই সহায়তা করে। তারা আতাতভুক্ত দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অটোমান সাম্রাজ্যকে টেনে আনে। যুদ্ধে এই মুসলিম শক্তির পরাজয় ঘটে এবং আরব অধ্যুষিত অঞ্চল ব্রিটিশ ও ফরাসী ঔপনিবেশবাদীদের দখলে চলে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা আবারো ইসলামের সবুজ পতাকাকে তাদের নিজেদের লুণ্ঠনাত্মক স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় তারা পাগড়ী-পরা হিটলারের ছবি সংবলিত কোটি কোটি প্রচারপত্র বিলি করে। প্রচারপত্রে বলা হয় হিটলার, হায়দার নাম নিয়ে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং নিজেকে ইসলাম ধর্মের রক্ষক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই পুস্তকের লেখক হিটলারের মোহাফেজখানায় এমন সব দলিল-দস্তাবেজ পেয়েছেন যাতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, এবং বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে নাৎসীরা মিসর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান ও ভারতের পশ্চিমাংশ দখলের সুচারু পরিকল্পনা তৈরী করে। হিটলারের বিশ্ব জয়ের সাধারণ পরিকল্পনার এই অংশটি বাস্তবায়িত করার কথা ছিল জার্মান প্যানজার ডিভিশনের সোভিয়েত উত্তর ককেশাস ও ট্রান্স-ককেশিয়া অতিক্রম করে তেহরান ও বাগদাদে উপনীত হওয়ার সাথে সাথেই। এটা তাই কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার হিটলারের গোপন পরিকল্পনার (যে পরিকল্পনা ছিল পরবর্তীতে মুসলিম দেশসমূহ দখলেরই প্রাথমিক পদক্ষেপ) নাম দেয়া হয়েছিল "বারবারোসা পরিকল্পনা"। নামটা দিয়ে-ছিলেন হিটলার নিজেই। মুসলিম প্রাচ্যের এক বিরাট অংশ দখলের উদ্দেশ্যে পরিচালিত তৃতীয় ক্রুসেডের নেতৃত্বে ছিলেন সম্রাট ফ্রিডরিখ বারবারোসা।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলিম জাতিসমূহকে দখল করার নাৎসী জার্মানির পরিকল্পনা বীর সোভিয়েত বাহিনীর হাতে হিটলারের

বাহিনী মার খাওয়ার পরই ভেঙ্গে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মুসলিম প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিপুল ক্ষতি করেছে। ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত মার্কিনরা লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও আলজিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিচালনা করে। ঐ সময়ে ওয়াশিংটন তাদেরকে খোলাখুলি বর্বর বলে আখ্যায়িত করতো। ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে মার্কিন নৌজাহাজ থেকে সুমাত্রা ও মুসলিম ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করা হয়। ১৮৩৩ সালে মার্কিনরা মস্কটের (বর্তমান নাম ওমান) সুলতানকে "মৈত্রী চুক্তি" স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। ঐ চুক্তিটিই ছিল কোনো আরব রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রথম অসম আন্তর্জাতিক চুক্তি।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অটোমান সাম্রাজ্যের সকল পরিবহণ পথের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে থাকে। ১৯১২ সালে, মার্কিন একচেটিয়া কারবারের পালের গোদা মর্গান সুশটার ইরানের সমগ্র আর্থব্যবস্থা ও অর্থনীতি তার নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপর হয়ে ওঠে। সারা বিশ্ব জানে যে ১৯৫৩ সালে যে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরানের শাহ ক্ষমতায় এসেছিল সে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সি. আই. এ)। তারপর সেখানে শুরু হয়েছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব—ইরানের গেস্টাপো, সাভাকের সন্ত্রাস। ইরান মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এটাও সকলেরই জানা আছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সমর্থন না থাকলে ইহুদীবাদী আগ্রাসকরা আরব জাতিসমূহের বিরুদ্ধে একের পর এক আগ্রাসনমূলক যুদ্ধ চালাতে পারতো না। তারা জর্দান নদীর পশ্চিম পার, গাজা এলাকা ও গোলান পর্বতমালাও দখল করতে পারতো না। তারা লেবাননকে আক্রমণ করার বা লেবাননকে ভেঙে ফেলার কথা ভাবতেও পারতো না।

মার্কিন যুক্তরাষ্টের শাসকচক্র এখন আফগানিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে; তারা সব রকম ভাবে চেষ্টা করছে আফগানিস্তানের মুসলমান ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে, মুসলিম আফগানিস্তান ও ইরান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করে তোলার। নিরপেক্ষতার ভাণ দেখালেও, ওয়াশিংটন প্রকৃত প্রস্তাবে ইরান-ইরাক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পেছনে ইন্ধন জুগিয়ে

যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশ ও জাতিসমূহের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষে উস্কানী দিয়ে যাচ্ছে।

ক্রুসেডারগণ ও পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা হলি সেপুলচার পুনরুদ্ধার ও খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসারের নামে মুসলিম প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল; ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা এটা করেছে দাসত্ব প্রথা ও দাসব্যবসা রোধের নামে। এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বিশ্ব জয়ের পরিকল্পনাকে টেকে রাখতে চাচ্ছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আড়ালে। ওয়াশিংটন তার দ্রুত মোতায়েনক্ষম বাহিনীর শক্তি দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজনৈতিক অভিমুখীনতা বদলে ফেলে যদি কোনো দেশ, আর সে দেশ মুসলিম দেশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, ওয়াশিংটনকে অসন্তুষ্ট করে তাহলে এই বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, ১৯৮২ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট রেগান কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দিয়েছেন। এর ঠিক পরপরই ওয়াশিংটন তথাকথিত সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) গঠন করে। এই কমান্ড গঠিত ১৯টি এশীয় ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকান দেশ নিয়ে, যার মধ্যে ১৮টিই মুসলিম দেশ।

কার্ল মার্কস * বলেছেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে প্রথমে বিয়োগান্ত ঘটনায়, তারপর প্রহসন হয়ে। একাদশ-ত্রয়োদশ শতকে খ্রীষ্টান ধর্মের নামে ক্রুসেড মুসলিম জাতিসমূহের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনে। ওয়াশিংটন এখন আয়োজন করেছে প্রহসনের। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ১৫০০ সামরিক ঘাঁটি, বিশাল পারমাণবিক অস্ত্রব্যবস্থা ও ইহুদীবাদীদের সাথে সামরিক মৈত্রী গঠনের মাধ্যমে কোটি কোটি মুসলমানকে তথাকথিত "সোভিয়েত হুমকির" হাত থেকে "রক্ষা" করার জন্য "কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ক্রুসেড" চালিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। অবশ্য, এ প্রহসন মুসলমানদের প্রতারিত করতে পারবে না। তারা জানে যে বিগত ৯০০ বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন আগ্রাসনমূলক যুদ্ধে যেসব উপনিবেশবাদীদের তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে তার মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ংকর।

---

* ১৯৮৩ সালে প্রাচ্যের মুসলমানগণ সহ বিশ্বের সকল প্রগতিশীল মানুষ কার্ল মার্কসের মৃত্যু শতবার্ষিকী পালন করে।

একই সাথে মুসলিম দেশসমূহের বহু জাতি আজ একথা আরো বেশি করে অনুধাবন করছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবারের দেশগুলোই হলো তাদের প্রধান ও প্রকৃত মিত্র।

লেখকের বহু বছরের গবেষণার ফসল এই বইটি। অনেক প্রাচীন দলিলপত্র ও বৈজ্ঞানিক রচনার সাহায্য নেয়া হয়েছে বইটি লিখতে গিয়ে। বইটি পড়ে পাঠক যদি বুঝতে পারেন উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কি ভয়ংকর ভূমিকা পালন করেছে মুসলমানদের জীবনে, তাহলেই লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে। লেখকের আশা, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, মানবজাতির ভবিষ্যত যার উপর নির্ভর করছে সেই বিশ্বব্যাপী শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামে তার ভূমিকা কি হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বইটি পাঠককে সাহায্য করবে।

প্রথম অধ্যায়

পর্তুগীজ, ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ উপনিবেশবাদীদের কবলে মুসলিম জাতি

১. পর্তুগীজ উপনিবেশবাদী সম্রাজ্যের পত্তন

ভাস্কো ডা গামার অধীনে চারটি ছোট সামুদ্রিক পোত ১৪৯৮ সালের মে মাসে সেকালের হিন্দুস্তানের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র কালিকট বন্দরে নোঙর ফেলে। জাহাজগুলি ছিল কামানসজ্জিত। হিন্দুস্তানে কামান তখনো এক অজ্ঞাত অস্ত্র। ঐ সময়ে কালিকট ছিল বহু সমুদ্রপথের সঙ্গমস্থল। বহু মূল্যবান চীনা তৈজসপত্র ভর্তি চৈনিক জাহাজ, মালাক্কা থেকে মসলা বোঝাই মুসলমান বণিকদের জাহাজ, আরব ও পারস্যের কারুশিল্পীদের তৈরী পণ্য নিয়ে হরমুজ ও এডেন থেকে যাত্রা করা জাহাজ কালিকটে এসে নোঙর ফেলতো, মাল ওঠাতো-নামাতো, আবার সমুদ্রে পাড়ি দিতো দূর কোনো বন্দরের উদ্দেশে। কালিকট ছিল এক সদাব্যস্ত সমুদ্র বন্দর।

স্থানীয় জামোরিন (পাহাড় ও সমুদ্রের অধিপতি) যদিও ছিলেন হিন্দু, এখানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় শত শত বছর ধরে পারস্পরিক সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যপথ আয়ত্ত করতে পারলে বিপুল বিত্ত-বৈভব ও সম্পদের অধিকারী হওয়া যাবে এটা লিসবন বুঝতে পারার পর পরই অবস্থা দারুণভাবে বদলে যেতে থাকে। সেই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল মুসলমান বণিকদের হাতে।

১৫০২ সালে আবার ভাস্কো ডা গামা কালিকট বন্দরে ফিরে আসেন ১৭টি জাহাজের এক বহর নিয়ে। এবং জাঁকালো উপাধি নিয়ে—"এডমিরাল অব দ্য ইন্ডিয়ান ওসেন" হিসেবে। পর্তুগীজরা কালিকটে এসেই

গোলাবর্ষণ করে, জামোরিন-এর প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কয়েকজন মুসলমান নাবিককে ধরে নিয়ে যায়। কালিকট বন্দরের এক বিরাট অংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ভাস্কো ডা গামা লিসবনে ফিরে যান। "বীরত্বের" জন্যে, এবং ভারত সম্পর্কিত মূল্যবান খবরাখবর নিয়ে যাওয়ায় রাজা প্রথম এমানুয়েল ভাস্কো ডা গামাকে নানাবিধ মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়ে ভূষিত করেন।

১৫০৫ সালে ১২টি জাহাজের একটি বহর ভারত মহাসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। নাবিকদল (ক্রু) ছাড়াও বহরে ছিল ১৫০০ জন অফিসার ও লোক-লস্কর। বহরের অধিনায়ক আলমেইদাকে "ভারত বিজয়ী" উপাধি প্রদান করা হয়। আর ইতিমধ্যেই পর্তুগালের রাজাকে মহামান্য পোপ ভূষিত করেন ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য ও সমুদ্রপথের অধিপতি উপাধিতে।

দেখা যাচ্ছে, ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে, পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লাভের আগেই, পর্তুগালের রাজা এমন একটি উপাধি গ্রহণ করেন যা থেকে ভারত মহাসাগরবিধৌত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর ওপর তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েমের ইচ্ছাই প্রকাশ পায়।

উল্লেখ্য যে, এই স্ব-আরোপিত উপাধির সমর্থনে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয় ৮ বছর আগে, ১৪৯৪ সালে। ঐ বছরে স্পেন ও পর্তুগাল তাদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

তোরদেসিলাস চুক্তি নামে পরিচিত ঐ চুক্তি অনুযায়ী স্পেন ও পর্তুগাল সারা বিশ্বকে কাগজে-কলমে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। আটলান্টিক মহাসাগরের কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম দিয়ে, অর্থাৎ ৫০ ডিগ্রি অক্ষাংশ বরাবর বিশ্বকে ভাগ করে ফেলা হয়। চুক্তিতে বলা হয়, ঐ লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে আবিষ্কৃত সব ভূখন্ড পাবে স্পেন, আর পূর্ব পার্শ্বের নব-আবিষ্কৃত সব ভূখন্ড যাবে পর্তুগালের হাতে।

তোরদেসিলাস চুক্তি পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার বরগিয়া-র অনুমোদন লাভ করে। এই চুক্তি যাতে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় সে ব্যাপারে পোপতন্ত্র খুবই আগ্রহী ছিল। পোপ তাই নতুন পরিস্থিতিতে তাঁর পুরনো পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্যে পর্তুগালকে এশিয়ার বিশাল ভূখন্ড দখলের আহ্বান জানান। ইসলামকে পরাভূত করাই ছিল এই নীতির মূল কথা। ক্রুসেডের সময় এই

নীতি সবচেয়ে জঘন্য চেহারা নেয়। দক্ষিণ এশিয়া অভিমুখে সেসময় যেসব জাহাজ যেতো সেসব জাহাজে যাজকদেরও পাঠানো হতো। উদ্দেশ্য ছিল তরবারি ও বন্দুকের জোরে খ্রীষ্টান ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া। তবে, খুব বেশি কাল যেতে না যেতেই তারা টের পায় যে এটা একটা অসম্ভব কাজ। প্রখ্যাত ভারতীয় কূটনীতিবিদ ও পন্ডিত কে. এম. পানিক্কার-এর এ সম্পর্কিত মন্তব্যের সাথে একমত না হয়ে পারা যায় না। তিনি তাঁর "এশিয়ায় পাশ্চাত্য প্রাধান্য" বইয়ে লিখেছেন ঃ

"আবিষ্কারের যুগে পর্তুগালের নীতির পেছনে সুসমাচার পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারটা ছিল নিছক ভাসাভাসা। কার্যক্ষেত্রে ঐ নীতি ছিল বিধর্মীদের, অর্থাৎ মুরদের ধ্বংস করা, ধর্মান্তরিত করা নয়।"

এখানে আমরা আর একটু যোগ করে বলতে পারি, আজো পশ্চিমা ইতিহাসবিদগণ ভাস্কো ডা গামার প্রশংসা করেন অকুন্ঠচিত্তে, ভারতে যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্যে। তবে, এই প্রশংসা করার সময় তাঁরা "ভুলে যান" তিনি যেসব জঘন্য অপরাধ সংঘঠিত করেছেন তার কথা।

কালিকটের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ উপনিবেশ-বাদীরা পারস্য উপসাগরে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্রপথের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গমস্থল হরমুজ বন্দরে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করে। এ জন্যেও তারা তাদের স্বভাব-সুলভ কপটতা ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এটা বলাই যথেষ্ট যে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের জলপথে অবাধে চলাচলের জন্যে এ্যাডমিরাল আফোনসো দ্য আলবুকারেক-এর নেতৃত্বে পর্তুগীজরা দক্ষিণ-পূর্ব আরবের বন্দরগুলোর ওপর প্রায়ই দস্যুসুলভ হামলা চালাতো। তখন ঐ বন্দরগুলো ছিল হরমুজ-এর আশ্রিত শহর। তারা ঐ সব বন্দরে নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, মসজিদ ও বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, মানুষজনের সহায়-সম্পত্তি লুটপাট করে। উপনিবেশবাদীরা হরমুজ-এর আশ্রিত শহরগুলোর অধিবাসীদের আটক করে তাদেরকে পর্তুগালের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতো এবং সেইভাবে আচরণ করতো। ১৫০৭ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হরমুজ পর্তুগালের আশ্রিত রাজ্য হতে বাধ্য হয়। তবে, স্থানীয় লোকজন, স্বাভাবিকভাবেই, ঐ চুক্তির কথা কিছুই জানতো না। পর্তুগীজরা নারী ও শিশুসহ হাজার হাজার আরবকে এক অকথ্য নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে—তারা তাদের

নাক ও কান কেটে দিতো।

তারপর পর্তুগীজরা মনে করতে থাকে যে, মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রুদ্ধ করাই শুধু যথেষ্ট নয়, কালিকট বন্দরও দখল করা দরকার। কালিকট হলো ভারত-হরমুজ-এডেন-মিসর সমুদ্রপথের শেষ বন্দর। আর তাই, আলবুকারেকের নৌবহরের আনাগোনা শুরু হলো ভারতের পশ্চিম উপকূলে।

১৫০৬ সালে ভাস্কো ডা গামা ও তার দলবল অনুচরদের বর্বরোচিত কার্যকলাপে উত্যক্ত হয়ে কালিকটের জামোরিন মিশরের মামলুক সুলতান আশরাফ কানসাহ আল ঘাওরির কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানান। উল্লেখ্য, কালিকটের হিন্দু শাসক খ্রীস্টান নাবিকদের "বন্ধুত্বের" আসল চেহারা দেখতে পেয়ে অবিলম্বে মিসরের মুসলমান শাসকের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ১৫০৭ সালের বসন্তকালে, কামান সজ্জিত মিসরের নৌবহর জামোরিনের সাহায্যার্থে আরব সাগরে এগিয়ে আসে। দিউ দ্বীপের অদূরে সাগরজলে পর্তুগীজ নৌবহরের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে মিসরের অভিজ্ঞ এ্যাডমিরাল মির হুসেইন তাঁর বহর নিয়ে জামোরিনের বহরের সাথে যোগ দেন। যুদ্ধে পর্তুগীজদের পরাজয় ঘটে, এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভারত মহাসাগরে এটাই হলো প্রথম নৌযুদ্ধ, যে যুদ্ধে উভয়পক্ষই কামান ব্যবহার করে। যাই হোক, আলমেইদা, যাকে পর্তুগালে ভারতের ভাইসরয় বলা হতো, অনুধাবন করতে পারেন যে, সবে অংকুরিত পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই তিনি সম্ভাব্য সকল শক্তি সমবেত করে দিউ দ্বীপ অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। এবার আলমেইদা জাহাজের কামান গোলার ওপর কিছুটা কম নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আরো নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি গোপনে দিউ দ্বীপের গুজরাটী গভর্নর মালিক আয়াজের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। মালিক আয়াজ ছিলেন খ্রীস্টান, পরে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হন। মালিক আয়াজ মির হুসেইনের নৌবহরকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দেন। বাধ্য হয়ে মিসরের এ্যাডমিরাল তাঁর ও জামোরিনের বহরের কয়েকটি জাহাজকে কালিকটে প্রেরণ করেন খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্যে। এই অবস্থায়, ১৫০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে, পর্তুগীজ বহরের সাথে দুর্বলতর মিসরীয় নৌবহরের আর একটি যুদ্ধ ঘটে। দুই পক্ষই সমানে সমানে যুদ্ধ করে, কোন জয়-পরাজয় হয় না। গুজরাটের

রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বুঝতে পেরে এ্যাডমিরাল মির হুসেইন তাঁর নৌবহর নিয়ে আরব সাগর ত্যাগ করে লোহিত সাগরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। পর্তুগীজরা পুনরায় ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে। ঐ সময় আলবুকারেক-এর নৌবহরও পারস্য উপসাগর থেকে কালিকটের কাছে এসে পৌঁছে। ১৫০৯ সালের হেমন্তকালে, ভারতের ভাইসরয়, আলবুকারেক আরেকবার চেষ্টা করেন কালিকট দখলের। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আচমকা এক আঘাতেই হিন্দু শাসককে খতম করে দেয়া, কারণ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাজা ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের মুসলমান বণিকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। যাহোক, জামোরিন ঐ আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ফলে সেবারের মতোও কালিকটের স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

তারপর আলবুকারেক সিদ্ধান্ত নেন তাঁর নৌশক্তিকে আরো উত্তরে সমবেত করে যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গোয়া দখল করার এবং সেখানে ভারত মহাসাগরে পর্তুগালের প্রধান ঘাঁটি গড়ে তোলার। ১৫১০ সালে পর্তুগীজরা গোয়া দখল করে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদগণ এই বিজয়কে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র, ইউরোপীয় প্রকৌশল ও খ্রীস্টীয় চেতনার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বলে দাবি করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে আলবুকারেক গোয়া দখল করেন এক ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। তিনি শুধু যে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার বিভেদের সুযোগই গ্রহণ করেন তাই নয়, তাদের মধ্যে বিভেদ আরো বাড়িয়ে তোলার জন্যেও নানা অপকৌশল গ্রহণ করেন। ১৫১০ সালের শুরুর দিকে তিনি তদানীন্তন ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী হিন্দু শাসিত রাজ্য বিজয়নগরের নতুন রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে দূত প্রেরণ করেন। দূতের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করে তিনি বিজয়নগর ও বিশাল বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে ওঠা মুসলিম শাসিত বিজাপুর রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সফলকাম হন। কৃষ্ণদেব তখন সমুদ্রপথে বাণিজ্য শুরুর চিন্তা ভাবনা করছিলেন এবং সেজন্য আরব সাগরের উপকূলকে তাঁর দখলে আনার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিজাপুরের সাথে যুদ্ধে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর জন্যে ঘোড়া আমদানি করাও জরুরী হয়ে দেখা দেয়। তাই তিনি তাঁর রাজ্যের সংলগ্ন গোয়া বন্দরকে দখল করার আলবুকারেকের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। গোয়া দখল সম্পর্কে রাজা প্রথম এমানুয়েলের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে তিনি লেখেন যে তাঁর সৈন্য ও নাবিকরা "চোখের সামনে

পড়েছে এমন কোন মুসলমানকেই রেহাই দেয় নি। যারা আত্মসমর্পণ করে নি তাদেরকে তাড়া করে মসজিদে ঢুকিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।"

এ থেকেই অনুমান করা যায়, ভারত মহাসাগরীয় উপকূলে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সূচনাতেই পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা হিন্দুস্তানের মুসলমান ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যকার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নস্যাৎ করার নীতি গ্রহণ করে। আর এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তারা কয়েক লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে, মুসলমানদের মসজিদ ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে। তার চেয়েও বড়ো কথা, তারা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে উস্কানী দিতে থাকে।

১৫১০ সালে গোয়া বন্দরকে ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজ উপনিবেশের রাজধানী করা হয়। কয়েক বছর পর, পর্তুগীজরা বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়ার বিপরীত দিকে হিন্দুস্তান উপকূলে এক চিলতে ভূমিখণ্ডের দখল নেয়। ১৫৪০-এর দশকে, বিজাপুর ও বিজয়নগরের মধ্যে আর এক প্রস্থ যুদ্ধের (এ যুদ্ধও মূলতঃ সংঘটিত হয়েছিল পর্তুগীজদের উস্কানীতে) সুযোগ নিয়ে উপনিবেশবাদীরা তাদের দখলীকৃত এলাকা আরো সম্প্রসারণ করে, এবং এর ফলে মুসলিম-শাসিত বিজাপুর তার সমুদ্রে যাবার পথ থেকে বঞ্চিত হয়।

উত্তর ভারতের বন্দরের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বানচাল করার উদ্দেশ্যে পর্তুগীজরা ১৫০৯, ১৫২১ ও ১৫৩১ সালে দিউ-এ অবস্থিত গুজরাট দুর্গ দখল করার চেষ্টা করে, কিন্তু পরপর তিনবারই তারা ব্যর্থ হয়। ক্যামবে উপসাগরের প্রবেশপথকে রক্ষার জন্যেই নির্মিত হয়েছিল এই দুর্গ। ঐ সময়ে ক্যামবে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৩৫ সালে গুজরাট ও তখনো নবীন মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। পর্তুগীজরা মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুজরাটকে সমর্থন করার বিনিময়ে পর্তুগীজদের হাতে দিউ ছেড়ে দিতে গুজরাটের সুলতান, বাহাদুরকে রাজী করায়। এই চুক্তির ফলে মুঘলদের সাথে গুজরাটের যুদ্ধ আরো ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ বেধে গেলে যখন সুলতান বাহাদুর দেখলেন পর্তুগীজরা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখছে না তখন তিনি পুনরায় দিউ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

পরে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনার সময় পর্তুগীজরা চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করে। ১৫৫৮-১৫৫৯ সালে, দিউ দ্বীপের বিপরীত দিকে, ক্যামবে উপসাগরের কূলে অবস্থিত দমনের দুর্গ দখল করে। ফলে তারা উপসাগরের প্রবেশপথ সম্পূর্ণ কব্জা করতে সক্ষম হয়। ক্যামবে বন্দর সুলতানের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরিণতিতে, গুজরাটের অর্থনৈতিক অবস্থা দারুণভাবে ভেঙে পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী সংঘর্ষ ও বিরোধও তীব্র আকার ধারণ করে। এর ফলে, মুঘল সাম্রাজ্যের সেই সময়ের অধিপতি আকবরের পক্ষেও সম্ভব হয়, ১৫৭২ সালে, গুজরাটকে দখল করে নেয়া। তবে, মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকগণও ক্যামবে বন্দরকে ব্যবহারের সুযোগ পাননি কোনোদিন। গোয়া পর্তুগীজদের দখলেই থেকে যায়। বিজয়নগরের শাসক-দের সাথে গোয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। ১৫৭০ সালে বিজয়-নগরের ক্ষমতাসীন হন সম্প্রসারণবাদী অরবিদু রাজবংশ। এদিকে, একমাত্র সুরাট ছাড়া আরব সাগর উপকূলে মুঘলদের হাতে আর কোনো বড় বন্দর ছিল না। ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। বিজয়নগর পর্তুগীজদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধলে হিন্দুস্তানের বৃহত্তম মুসলিম সাম্রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে বিজয়নগরের সম্পর্কের অবনতি ঘটে দারুণভাবে। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার ফলে, এবং পর্তুগীজরা হিন্দুশাসিত ও মুসলিমশাসিত রাজ্যগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কে নাক-গলানো শুরু করলে ভারতের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে এবং ভারতের রাজ্য ও জনগণের অর্থনৈতিক বিকাশও বাধা-গ্রস্ত হতে থাকে।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি এবং এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্রমবর্ধ-মান ভূমিকার প্রশ্নটিকে লিসবন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ১৫১০ সালেই পর্তুগালের রাজধানী লিসবন এই সিদ্ধান্তে আসে যে এডেন, হরমুজ ও মালাক্কা হলো বিশ্ববাণিজ্যের তিন প্রধান কেন্দ্র। এই তিনটি কেন্দ্র দখল করতে পারলেই পর্তুগালের শাসকরা "বিশ্বের নেতা" হতে পারবে। কারণ এডেন, হরমুজ ও মালাক্কা হলো সেই তিনটি চাবি যা দিয়ে সারা বিশ্বের ধনভান্ডারের দরোজা খোলা যায়। আর সেজন্যেই, গোয়াকে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের রাজধানী করার পরপরই আলবুকারেক ১৫১১ সালে ১৯টি জাহাজ নিয়ে মালাক্কা অভিমুখে যাত্রা

শুরু করেন।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে মালাক্কার সালতানাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। ইসলাম প্রসারের, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রসারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে মালাক্কা। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে, চীন, মোলুকাস (মসলার দ্বীপ) এবং ভারতের কালিকট ও ক্যামবে বন্দরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণে, মালাক্কা ছিল, পর্তুগীজ নৌচালক টম পিরেস যেমন বলেছিলেন, বিশ্বের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল ও বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর। ১৫১২ থেকে ১৫১৫ সাল পর্যন্ত টম পিরেস মালাক্কায় ছিলেন এবং তিনি 'প্রাচ্যের দেশগুলোর সমীক্ষা' শীর্ষক এক চমৎকার ভ্রমণকাহিনী লিখে গেছেন।

১৫১১ সালের ২৪শে জুলাই, আলবুকারেকের নৌবহর মালাক্কার পোতাশ্রয়ে নোঙর ফেলে। কোনরকম হুঁশিয়ারী না দিয়েই তিনি তাঁর নাবিকদের নির্দেশ দেন মুসলমানদের সব জাহাজের ওপর কামানের গোলাবর্ষণ করতে এবং সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে। চীনাদের ও হিন্দুদের জাহাজকে গোলাবর্ষণের হাত থেকে রেহাই দেয়া হয়। তারপর, আলবুকারেক শহর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন। পর্তুগীজ নাবিক ও সৈনিকদের উদ্দেশে এক জ্বালাময়ী ভাষণে তিনি বলেন, এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে তারা তাদের ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন এবং তারা হযরত মোহম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীদের আলোকবর্তিকা এমনভাবে নিভিয়ে দেবেন যেনো তা আর কোনোদিন প্রজ্বলিত হতে না পারে। তিনি তাঁর ভাষণে আরো বলেন, "আমি স্থিরনিশ্চিত যে, আমরা যদি মালাক্কার ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে মুরদের হটিয়ে দিতে পারি, তাহলে কায়রো আর মক্কা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে, ভেনিসও মসলার ব্যবসা করতে পারবে না, যদি না তার বণিকরা পর্তুগালের কাছ থেকে সেটা ক্রয় করে।"

এই কথাগুলোর মধ্য দিয়েই পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই নীতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি দান করেন যে নীতি ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারকারীরা অনুসরণ করা শুরু করে। উপনিবেশ সম্প্রসারণের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পেছনে যে মতাদর্শ, যুক্তি, অর্থাৎ ইসলাম ঠেকানো, সেটারও সূত্রপাত তখন থেকেই।

নয় দিন ধরে প্রচন্ড যুদ্ধের পর অবশেষে পর্তুগীজরা মালাক্কা দখল করতে সক্ষম হয়। মালাক্কা দখলের পরপরই আলবুকারেক একটি দুর্গ

ও একটি গীর্জা নির্মাণের কাজে হাত দেন। তিনি একটা বিরাট সেনা-নিবাস গড়ে তোলেন এবং মালাক্কাকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

মালাক্কা দখলের মধ্য দিয়ে পর্তুগীজরা প্রচুর ধনসম্পদ হাতিয়ে নেয়। রাজা একাই লাভ করেন ২ লক্ষেরও বেশি স্বর্ণ ক্রুজেইরস। তবে, আলবুকারেক তাঁর লুণ্ঠিত ধনসম্পদের বিরাট অংশই গোয়া ও লিসবনে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হন। মূল্যবান পাথর, মণিমাণিক্য ও স্বর্ণ বোঝাই তাঁর ফ্ল্যাগশীপ ফেরার পথে সুমাত্রার অদূরেই চড়ায় আটকে যায়। ভাইসরয় এবং তাঁর ক্রুদের কেউ কেউ প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হন, কিন্তু ঐসব মূল্যবান ধনসম্পত্তি নিয়ে ফ্ল্যাগশীপটি সেখানেই ডুবে যায়।

মালাক্কা দখলের পর আলবুকারেক মসলা দ্বীপে দুই দুইটি অভিযান চালান। ১৫১৩ সালে, দ্বিতীয় অভিযানে, তিনি তিদোর ও তেরনাতের সুলতানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড়ো দুটি দ্বীপ হলো এই তিদোর আর তেরনাতে। দ্বীপ দুটি, ইউরোপে দারুণভাবে সমাদৃত, লবঙ্গের জন্যে প্রসিদ্ধ। পরবর্তীতে, পর্তুগীজরা মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে জটিল নীতি অনুসরণ করা শুরু করেঃ একই সঙ্গে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতানকে সমর্থন প্রদানের নীতি। ১৫২১ সালের শেষের দিকে, স্পেনিশ নৌযান ভিক্টোরিয়া এখানে এসে পৌঁছালে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। স্পেনে ফেরার পথে, ফার্ডিনান্ড মাগেল্লানের নৌবহরের শেষ জাহাজ ভিক্টোরিয়া এখানে নোঙর করে (প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কারের পর, প্রথম বিশ্ব পরিভ্রমণের পথে ভিক্টোরিয়া তখন দেশে ফিরছিল)। পোতাশ্রয়ে নৌযান নোঙর করেই স্পেনীয়রা তিদোরের সুলতানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। পর্তুগীজরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের কাছে এই বলে কঠোর অভিযোগ করে যে স্পেন ১৪৯৪ সালে স্বাক্ষরিত তোরদেসিলাস চুক্তি লঙ্ঘন করছে। স্পেনীয়রা "পর্তুগালের প্রভাব বলয়ে" অনুপ্রবেশ করেছে। পর্তুগালের অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত কিনা সেটা দেখার জন্যে ১৫২৪ সালে একটা যৌথ কমিশন গঠন করা হয়। ১৪৯৪ সালে, যখন তোরদেসিলাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তখনো প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে সেই সময়কার মানচিত্র ও পরবর্তীতে আবিষ্কৃত মহাসাগরের প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। সারা ষোড়শ শতাব্দী জুড়ে এই দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ১৫৮০-এর দিকে এসে ব্রিটিশরাও যোগ দেয় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

মালাক্কায় নিজেদের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে পর্তুগীজরা ১৫২০-এর দশকে ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করে। ঐ সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিদের মধ্যে চরম বিভেদ-বিদ্বেষ চলছিল। যা হোক, বারবার শত চেষ্টা ও রক্তক্ষয়ী অভিযান চালিয়েও পর্তুগীজরা ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রসার রোধ করতে ব্যর্থ হয়।

১৫১১ সালে, মালাক্কা থেকে গোয়ায় ফিরেই আলবুকারেক আর একটা দখল অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এবারের অভিযান লোহিত সাগরে। লিসবনে পাঠানো রিপোর্টে তিনি বলেন যে, যতোদিন মুসলমানদের মধ্যে এই আশা থাকবে যে অটোমান সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী একদিন না একদিন এই অঞ্চলকে পুনরুদ্ধার করবে, ততোদিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানের পশ্চিম উপকূল ও পারস্য উপসাগরে পর্তুগীজদের প্রাধান্য নিরংকুশ হবে না। আলবুকারেক আরো উল্লেখ করেন যে, তাই কৃষ্ণসাগর থেকে ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরে যাতায়াতের সকল নৌপথ বন্ধ করে দেয়া খুবই জরুরী। তাঁর মতে মুসলিম এশিয়ায় পর্তুগীজ ক্ষমতা রক্ষার জন্যে তিনটি লক্ষ্য অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ : ১. এডেন দখল করা এবং তার মাধ্যমে "মক্কা প্রণালীর" ওপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা, ২. "বসরা প্রণালীর" ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্যে হরমুজকে কব্জা করে রাখা, এবং ৩. গোয়া এবং দিউকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভূগোল বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ভারতের ভাইসরয় এডেন উপসাগরকে (বাব আল মানদেব প্রণালী) "মক্কা প্রণালী" বলে উল্লেখ করেছেন। পর্তুগীজদের কোন মানচিত্র অথবা পর্চাতে এই প্রণালীকে কখনো "মক্কা প্রণালী" বলে অভিহিত করা হয়নি। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের কেন্দ্রভূমি মক্কার বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়ে যাওয়া।

আলবুকারেক "বসরা প্রণালীকে" অর্থাৎ হরমুজ প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে হরমুজকে কব্জা করে রাখাটাকে খুবই প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেছিলেন। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বসরা তখন এক বর্ধিষ্ণু শহর। শাত্তিল আরব নদী যেখানে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে তার খুব কাছেই অবস্থিত বসরা। আলবুকারেক এই বাণিজ্য কেন্দ্রের কথাও তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন এজন্যে যে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র উপসাগরের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। তারা অটোমান সাম্রাজ্য ও

পারস্যের সাফাভিদ রাজবংশের মধ্যকার বিরাজমান বিরোধকেও নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়।

লিসবন আলবুকারেকের পরিকল্পনা অনুমোদন করে এবং তাঁকে এডেন দখলের নির্দেশ দেয়। ১৫১৩ সালে আলবুকারেক এডেন দখলের অভিযান চালান, কিন্তু এডেনের সেনাবাহিনী তাঁর সেই অভিযান ব্যর্থ করে দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে তিনি তাঁর ক্যাপ্টেনদের নির্দেশ দেন লোহিত সাগরে যাতায়াতকারী মুসলমানদের জাহাজের ওপর লুঠ-তরাজ চালাতে এবং এডেন ও জিদ্দা অভিমুখী সব জাহাজকে বাধাদান করতে। এর পর পর্তুগীজরা লোহিত সাগরে লুঠতরাজ শুরু করে। তাদের হাতে আটক জাহাজগুলোকে তারা পানিতে ডুবিয়ে দিত, জাহা-জের নাবিক ও যাত্রীদের, নারী-পুরুষ, বয়স নির্বিশেষে নাক, কান এমনকি হাত পর্যন্ত কেটে দিত। পর্তুগীজরা মুসলমানদের ওপর চরম পৈশাচিক হতেও কখনো কুন্ঠাবোধ করেনি।

সেই সময়ে, লোহিত সাগর থেকে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকর্তা রাজা প্রথম ইমানুয়েলকে দুটি কৌতুহলোদ্দীপক চিঠি লেখেন। প্রথমটিতে তিনি ইথিওপিয়ার পাহাড়শ্রেণীর অংশবিশেষ ভেঙে ফেলে নীলনদের ওপর বাঁধ দিয়ে তার গতিপথ উত্তর থেকে পূর্বে পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মিসরের উচ্চভাগকে নীলনদের পানি থেকে বঞ্চিত করা এবং কায়রো ও তার আশেপাশের সমগ্র এলাকাকে মরু-ভূমিতে পরিণত করা। এর ফলে তুর্কী বাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হবে আর পর্তুগীজরাও মিশর ও সুদানের লোহিত সাগর উপকূলে নিজেদের অবস্থানকে সংহত করার সময় পাবে। এই পরিকল্পনা যে একেবারেই অবাস্তব সেটা কিন্তু আলবুকারেক একটুও ভাবেন নি। তাই তিনি রাজাকে অনুরোধ করেন কালবিলম্ব না করে মাদেইরা দ্বীপ থেকে বাঁধ নির্মাণকারী দক্ষ বিশেষজ্ঞদের ইথিওপিয়ায় পাঠিয়ে দিতে।

দ্বিতীয় চিঠিতে (যে চিঠির প্রসঙ্গ ভূমিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে) আলবুকারেক মদিনা দখল ও হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর শবদেহ লিসবন নিয়ে যাওয়ার জন্যে পদাতিক বাহিনী প্রেরণের সুপারিশ করেন।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে আলবুকারেক ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পোষণ করতেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, ইসলামের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষবোধ ছিল সামগ্রিকভাবে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক নীতির এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ হরমুজ দখ-

লের জন্য পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা আর একটা প্রচেষ্টা নেয় ১৫১৪ সালে। পারস্যের সেনাবাহিনী গমব্রুন-এ উপনীত হয়ে দ্বীপের পক্ষ নিলে পর্তুগীজদের সেই অভিযানও ব্যর্থ হয়। তাছাড়া এর পর হরমুজের শাসক পর্তুগীজদের সাথে সম্পাদিত তাঁর চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করেন এবং শাহ ইসমাইলকে তাঁর সার্বভৌম অধিকর্তা বলে মেনে নেন।

এই পরিস্থিতিতে আলবুকারেক আরব সাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে আর একটি নতুন দখলাভিযান চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

১৫১৪ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে রাজা প্রথম ইমানুয়েলকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে আলবুকারেক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পারস্য উপসাগরের অধিকর্তা হতে হলে অবশ্যই এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে হরমুজের সাথে লোহিত সাগরের অন্যসব পোতাশ্রয়ের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য আলবুকারেক প্রথমে এডেন প্রণালী ও লোহিত সাগরে শক্তি সমাবেশের, এডেন দখলের, লোহিত সাগরের কামারান ও ফারাসান দ্বীপ দখলের, ইথিওপিয়ার মাসাওয়া বন্দরের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের, এবং তারপর জিদ্দা আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারপর "সকল শক্তি নিয়োজিত করা হবে মক্কা নগরকে ধ্বংস করার জন্যে"। ইসলামের কেন্দ্রভূমিকে ধ্বংস করে এবং লোহিত সাগরে মিশরীয় ও তুর্কী জাহাজের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়ে আলবুকারেক আশা করেছিলেন হরমুজ ও হরমুজের অধীন সব দ্বীপ ও বন্দরকে কব্জা করতে। তিনি একদিকে দূরপ্রাচ্যের সাথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের সকল বাণিজ্যপথ ও অর্থনৈতিক যোগাযোগকে পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছিলেন।

তবে লোহিত সাগরকে কব্জা করার এবং মক্কা নগরীকে ধ্বংস ও ইসলামকে নস্যাৎ করার আলবুকারেক ও লিসবনের পরিকল্পনা দারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির অবনতি ঘটার কারণে পর্তুগীজদের সামনে তাদের উপনিবেশবাদী নীতি বাস্তবায়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৫১৪ সালের আগস্টে পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে এক প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যায় এবং যুদ্ধে পারসিক সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটে। অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারস্যের শাহ ইসমাইলকে সকল ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের

মৌখিক ও লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলবুকারেক ১৫১৫ সালে একটি পারসিক-পর্তুগীজ চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, শাহ হরমুজ ও মসকটের ওপর পর্তুগীজ প্রাধান্য স্বীকার করে নেন। পরিবর্তে পর্তুগীজরা পারসিক সেনাবাহিনীকে বাহরাইন ও পারস্য উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে তাদের জাহাজে করে পার করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তুরস্কের সেনাবাহিনীর প্রান্তশাখায় আক্রমণ করার জন্যে বাহরাইন ও পারস্য উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে পারসিক সেনা অবতরণ তখন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল। আলবুকারেক একাধিক চিঠিতে শাহ ইসমাইলকে আহ্বান জানান জেরুজালেম ও কায়রোর বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সামরিক জোট গঠনের জন্যে।

যাই হোক, ১৫১৬-১৫১৭ সালে পর্তুগীজরা অটোমান সাম্রাজ্যের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় পাদে তুরস্কের নৌবহরও পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরে আনাগোনা শুরু করে। সপ্তদশ শতকের শুরুতে, প্রথম শাহ আব্বাসের আমলে পারস্য শক্তিশালী হয়ে উঠলে, পারস্যও পারস্য উপসাগরের ওপর বিশেষ নজর দেয় এবং হরমুজ থেকে পর্তুগীজদের উৎখাত করার জন্যে মিত্রশক্তি লাভের চেষ্টা শুরু করে।

পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে। প্রাচ্যের মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ওপর এক দারুণ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তছনছ করে ফেলে।

এমনকি এখনো, পাশ্চাত্যের পন্ডিতরা পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা মুসলমানদের প্রতি যে জঘন্য দুর্ব্যবহার করেছে, সেটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার, নিদেনপক্ষে এই প্রথম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অপরাধকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করে থাকে। পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিশারদ ও প্রচারবিদগণ এটা করছে প্রথমতঃ, ভাস্কো ডা গামার নৌবহর কর্তৃক সূচিত উপনিবেশবাদের আতঙ্কময় যুগ যাতে প্রাচ্যের জাতিসমূহ বিস্মৃত হয় সেজন্যে, এবং দ্বিতীয়তঃ, শুধু পর্তুগীজরা একাই নয়, ইউরোপের আরো কয়েকটি ঔপনিবেশিক শক্তিও যে এই লুন্ঠনাত্মক অভিযানে জড়িত ছিল সেই ঘটনাকে গোপন করার জন্যে।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৫০৫ সাল থেকে শুরু করে, এ্যান্টওয়ার্পের

মুকুটহীন রাজার মতো নাবিকদের নেতৃত্বে ওলন্দাজ পুঁজিপতিরা ভারত সংশ্লিষ্ট পর্তুগীজ বণিক সমিতির (পর্তুগীজ সরকার এই সমিতিকে প্রাচ্যের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের, বিশেষ করে মসলা আমদানির একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে) কার্যাবলীতে, নীরব হলেও, ক্রমবর্ধমান সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তার ওপর, খোদ পোপতন্ত্রও পর্তুগালের উপনিবেশবাদী নীতির সাথে সক্রিয়-ভাবে জড়িত ছিল। শেষের দিকে, পর্তুগাল দুর্বল হয়ে পড়তে থাকলে ব্রিটেন ও জার্মানির একচেটিয়া কারবারীরা, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা পর্তুগাল অধিকৃত বিশাল এলাকা একে একে নিজেদের কবলে নিয়ে আসে। ইউরোপের সবচেয়ে আদি উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্য কেন যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তার ব্যাখ্যা বহুলাংশে এর মধ্যেই পাওয়া যায়। ১৯৭৪ সালের বিপ্লবের সময়েও ৯২০০০ বর্গ-কিলোমিটার আয়তনের পর্তুগালের, নামেমাত্র, অধীনে ছিল ২০ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার বিদেশী ভূখন্ড।

ভারত মহাসাগর সম্পর্কিত পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক নীতির ইতিহাস এটাই তুলে ধরে যে পর্তুগীজরাই প্রথম ইউরোপীয়, যারা ধর্মীয় বিরোধকে সক্রিয় রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমরা দেখেছি, তারা হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে বিরোধ উস্কে দিয়েছে। তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রেও অবলম্বন করেছে এই একই পদ্ধতি। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্যে পর্তুগীজরা শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ পারস্য ও সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠ তুরস্কের মধ্যে অনৈক্যের বীজ ছড়িয়েছে। এরপর আমরা দেখাবো, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও কিভাবে দীর্ঘকাল জুড়ে এই একই বিভেদ সৃষ্টির পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। বর্তমানেও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই একই কাজ করে যাচ্ছে, তবে আরো ক্রমবর্ধমান মাত্রায় ও জোরের সাথে।

প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও ভারত মহাসাগর প্রায় সম্পূর্ণ করায়ত্তে চলে আসায় পর্তুগীজরা যে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ অর্জন করছিল তা ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী শাসকচক্র, বাণিজ্যিক ও শিল্পমহলে এক দারুণ ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তারাও পর্তুগীজদের সাথে সমানে সমানে হওয়ার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে।

ষোড়শ শতাব্দীতে নেদারল্যান্ডে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উন্মেষ, বাণিজ্য ও নৌশিল্পের বিকাশ, এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ওলন্দাজ উপনিবেশবাদী সম্প্রসারণে গতিবেগ সঞ্চার করে। ওলন্দাজরা প্রথম উপনিবেশবাদী অভিযান চালায় ১৫৯০-১৫৯৩ সালে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। তবে তাদের উপনিবেশবাদী অভিযান সবচেয়ে প্রকট রূপ নেয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ওলন্দাজরা জাভার পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয় ১৫৯৬ সালে। তারা পর্তুগীজ প্রতিরোধ মোকাবেলা করে বানটাম সালতানাতের মলুক্কাস, বান্দা দ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপের মালাক্কায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। শুরু থেকেই ওলন্দাজরা এখানকার মুসলিম রাজন্যদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়। ১৬০২ সালে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের পর ওলন্দাজরা প্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজদের আক্রমণ করে এবং তাদেরকে মলুক্কাস থেকে হটিয়ে দেয়। একই সাথে, ঐ কোম্পানি এ্যামবোয়না দ্বীপে একটি স্থায়ী ঔপনিবেশিক প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপন করে।

১৬১৯ সালে তারা দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় ওলন্দাজ উপনিবেশ সম্প্রসারণের প্রধান ঘাঁটি জাভার বাটাভিয়ায় সরিয়ে আনে।

ইংরেজ শাসক ও বাণিজ্যিক মহলে মসলার ব্যবসা থেকে মুনাফার ক্ষুধা বিশেষ করে তীব্র হয় ফ্রান্সিস ড্রেক তাঁর তিন বছরের সমুদ্র পরিক্রমা শেষে ১৫৮০ সালে লন্ডনে ফিরে এলে। সমুদ্র পরিক্রমার এক পর্যায়ে তিনি টেরনাটে (মলুক্কাস দ্বীপপুঞ্জ) দ্বীপে নোঙর ফেলেন। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তখন সেখানে যে বিদ্রোহী মনোভাব বিরাজ করছিল তার সুযোগ নিয়ে তিনি সেখানকার শাসকের সাথে যোগাযোগ করেন এবং বিপুল পরিমাণ লবঙ্গ ক্রয় করেন। সাত বছর পর তিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সমুদ্র-

পথে একটি বিশাল পর্তুগীজ জাহাজ দখল করেন। জাহাজটি গোয়া থেকে লিসবন যাচ্ছিল। জাহাজটি লুঠ করে তিনি যে মাল-পত্র পান তার মধ্য থেকে শুধু মসলাই লন্ডনের বাজারে বিক্রি করেছিলেন ১ লক্ষ ৮ হাজার পাউন্ড মূল্যের (বর্তমান মূল্যে ১ কোটি পাউন্ডেরও বেশি)।

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ১৫৮৮ সালের নৌযুদ্ধে ইংরেজরা স্প্যানিশ আর্মাডাকে পরাজিত করে। স্পেন তার এই বৃহত্তম নৌবহর গড়ে তুলেছিল ইংলন্ডকে জয় করার উদ্দেশ্যে। তারপর থেকে ভারত ও আমেরিকা হতে মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী পরিবহণকারী স্পেনিশ ও পর্তুগীজ নৌবহরের ওপর ব্রিটিশ জাহাজের আক্রমণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় (১৫৮১ থেকে ১৬৪০ সাল পর্যন্ত পর্তুগাল সাময়িকভাবে স্পেনের সাথে যুক্ত ছিল)। এইসব ঘটনা ও ব্রিটেনে শিল্পের দ্রুত বিকাশ ১৬০০ সালে কুখ্যাত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠনের পথ করে দেয়। এই কোম্পানিই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলে।

ব্রিটিশরা ভারতের সাথে দারুণ লাভজনক ব্যবসায় হাত দেয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমুদ্রপথে ভারতের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তখনো মূলতঃ পর্তুগীজরাই ছিল সর্বেসর্বা। তবে তারা অন্ধের মতো ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুখিয়ে ছিল এবং সেকারণে মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। এই অবস্থা বিবেচনা করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্সকে তাঁদের দূত হিসেবে মুঘল সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী আগ্রায় প্রেরণ করেন। তবে, মুঘল দরবারে পর্তুগীজ প্রতিনিধির তীব্র বিরোধিতার মুখে তিনি দীর্ঘ তিন বছর মুঘলদের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্যে কোনো সুবিধা আদায় করতে ব্যর্থ হন।

সুরাট বন্দরের অদূরে ব্রিটিশরা বোমা মেরে দুই দুইটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাটে ব্যবসা কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেয়া হয়।

১৬১৫ সালে রাজা প্রথম জেমসের সরকারী দূত হিসেবে স্যার টমাস রো আগ্রা এসে পৌঁছান। সমুদ্র বাণিজ্যে মুঘলদের সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আশ্বাস দিয়ে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্যে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হন। ১৬১১

সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার ব্যবসাকেন্দ্র সুরক্ষিত বোম্বাইতে সরিয়ে আনে। ব্রিটিশ রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগীজ রাজতনয়াকে বিয়ে করার সুবাদে যৌতুকের অংশ হিসেবে পেয়েছিলেন এই বোম্বাই নগরী।

এই সময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব উপকূলের দিকে করোমনডেল উপকূল ও বাংলার দিকে নজর দিতে শুরু করে, কারণ এই অঞ্চলেই তৈরি হতো সুদক্ষ মুসলিম হস্তশিল্পীদের তাঁতে বোনা প্রসিদ্ধ ভারতীয় সুতীবস্ত্র। ঐ সময়ে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় এই সুতীবস্ত্রের চাহিদা ছিল প্রচন্ড। আমাদের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালিকরা এই সুতিবস্ত্রকে কিভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে অনুপ্রবেশের কাজে, একাধিক মুসলিম দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলতে এবং সেখানে রাজনৈতিক প্রভাব কায়েমে ব্যবহার করেছে।

সেই ১৬৩৯-১৬৪০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক হিন্দু রাজপুত্রের কাছ থেকে করোমনডেল উপকূলে মাদরাসাপতনাম গ্রামের কাছে বছরে ৬০০ পাউন্ড মূল্যের বিনিময়ে এক খন্ড ভূমি লীজ নেয়। কোম্পানি ঐ ভূখন্ডের ওপর একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং তার নাম দেয় ফোর্ট সেন্ট জর্জ। এই দুর্গকে ঘিরেই দ্রুত বেড়ে ওঠে মাদ্রাজ শহর। পরবর্তীতে এই মাদ্রাজই দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ ক্ষমতার প্রধান ঘাঁটি ও কেন্দ্রে পরিণত হয়। একই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাদের কর্ম পরিধির আওতা বাংলাদেশেও প্রসারিত করে।

পশ্চিম উপকূলে ব্যবসাকেন্দ্র সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুখপাত্রগণ আগ্রার সম্রাট ও তাঁর মন্ত্রীদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে তাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে পর্তুগীজ নৌক্ষমতাকে দুরস্ত করা। করোমনডেল উপকূলে তাদের ঘাঁটি শক্তিশালী করার সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কারণ দেখায় যে তারা হিন্দু রাজন্যদের নস্যাৎ করতে এবং দক্ষিণ ভারতে মুঘলদের প্রভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্যেই সেটা করছে। সবশেষে, বাংলায় অনুপ্রবেশের যুক্তি হিসেবে দেখানো হয় যে তারা বাংলার নবাবের বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক প্রতিহত করতে মুঘলদের সাহায্য করবে। সেই সময়ে বাংলার নবাব আগ্রার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে চেষ্টা করছিলেন।

যাহোক, ১৬৮০-এর দশকের শেষ দিকে বিচক্ষণ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রকৃত উদ্দেশ্য, হিন্দুস্তানের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ও গুজরাটের মুঘল আধিপত্য নস্যাৎ করার উদ্দেশ্য, অনুধাবন করতে পারেন। এই উদ্দেশ্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৌবহর গুজরাট উপকূলে সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে একের পর এক আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে শুরু করে। কোম্পানির নৌবহরের ক্যাপ্টেনগণ কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক ১৬৮৬ সালে প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টাই প্রকৃত প্রস্তাবে শুরু করে এইসব অভিযানের মধ্য দিয়ে। এইসব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে একটি বেসামরিক ও সামরিক ব্যবস্থা স্থাপন করা এবং সেই ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে স্থানীয় লোকজনদের কাছ থেকে কর আদায় করা। ভারতকে শস্ত করে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্যেও এর প্রয়োজন ছিল।

মুঘলদের প্রত্যক্ষভাবে মোকাবেলা করার এইসব তৎপরতা ও পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে আওরঙ্গজেব ১৬৮৭ সালে ব্রিটিশদের বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই আদেশ অমান্য করলে মুঘল সেনাবাহিনী বোম্বাই দখল করে নেয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরা শান্তি স্থাপনের জন্য বিনয়াবনত হতে বাধ্য হয়। তারা মুঘলদের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৬৯০ সালে, আওরঙ্গজেবের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পরপরই, মাদ্রাজে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিগণ বাংলায় তাদের ব্যবসা-কেন্দ্রে ফিরে যাবার ব্যাপারে বাংলার নবাবকে রাজী করাতে সমর্থ হন। বিনিময়ে তারা তাঁকে (বাংলার নবাবকে) সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের গোপন প্রতিশ্রুতি দেয়।

একই বছরে, ১৬৯০ সালেই, জোব চার্নকের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু প্রতিনিধি হুগলী নদীর মোহনায়, কলকাতায়, বসতি স্থাপন করে। পরে (১৯১১ সাল পর্যন্ত) এই কলকাতা ভারত মহাসাগরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও ব্রিটিশ রাজধানীতে পরিণত নয়।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে

তার নীতি আরো জোরদার করে। প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানি মুঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের সুযোগকে কাজে লাগায়। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ শুরু হলে সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে। ১৭১৪ সালে কোম্পানি নতুন সম্রাট ফররুখ শিয়রের কাছে দিল্লীতে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠায়। (নতুন সম্রাট রাজধানী আগ্রা থেকে পুনরায় দিল্লীতে নিয়ে আসেন)। সুরামান এর নেতৃত্বাধীন এই প্রতিনিধিদল সম্রাটের কাছ থেকে কোম্পানির জন্যে বাংলায় পুনরায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার এবং কলকাতার চতুঃপার্শ্বের ৩৮টি গ্রাম লাভ করে। সম্রাট এক ফরমান দিয়ে কোম্পানিকে এইসব অধিকার প্রদান করেন। ফরমানে কোম্পানিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শুল্ক রেয়াতও দেয়া হয়। এভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের সামনে বাংলায় প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, নতুন চুক্তি বলবৎ হওয়ার বেশ কয়েক বছর পর নবাবের অধীন বাংলার মুসলিম প্রশাসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কোম্পানির প্রতিনিধিরা শুধু প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বই তুচ্ছ করছিল না, অর্থনৈতিক দিক থেকেও নানান ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়েছিল। হিন্দু বণিক সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী সদস্য উমিচাঁদ ও জগৎশেঠের সাহায্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রপ্তানী পণ্যের উৎপাদনকারী মুসলিম হস্তশিল্পীদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলার তৎপরতা শুরু করে। একই সাথে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোও আরম্ভ করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের অনেক আগেই, সেই ষোড়শ শতকের শেষভাগেই ব্রিটিশ শাসক ও বাণিজ্যিক মহল ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের, বিশেষ করে মলুক্কাস দ্বীপের, মসলা বাণিজ্যের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী হয়ে উঠতে শুরু করে। ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন্দোনেশিয়ায় নিয়মিত নৌ-অভিযান পরিচালনা শুরু করে। তবে তখনো পর্তুগীজরা তাদের মালাক্কার সুরক্ষিত ঘাঁটি থেকে মলুক্কাস, তিদোর ও টেরনাটে তাদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ফিলিপাইনে ঘাঁটি-গাড়া স্পেনিশরাও ইন্দোনেশিয়ায় কিছুটা জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়। ১৬০২ সালে, নেদারল্যান্ডে সংযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানি গঠিত হওয়ার পর, ওলন্দাজরাও মলুক্কাস দ্বীপমালায় ঘাঁটি গেড়ে বসে। এই অবস্থায়, ব্রিটিশ মসলা শিকারীরা এ্যামবয়না দ্বীপ ও তার দক্ষিণে অবস্থিত বানদা দ্বীপমালার দিকে নজর দেয়। জাভার মুসলিম সালতানাতের অধীন বানটাম-এ স্থাপিত ঘাঁটি থেকে (কট্টর ইসলামবিরোধী ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রিটিশ বণিকরা এই ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করে) ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা ১৬১০ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বানদা দ্বীপমালায় অভিযান চালায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে মলুক্কাস দ্বীপমালায় শক্ত হয়ে বসা ওলন্দাজরা মূল্যবান মসলাপাতি, যেমন লবঙ্গ, জৈত্রী ও জায়ফলের ব্যবসার ওপর একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের শাসন কায়েমের জন্যে ওলন্দাজরা শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু পাশাপাশি তারা এটা দেখানোর ভাণ করে যে তারা স্পেনিশ ও পর্তুগীজ উভয় ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের হাত থেকে এবং জাভার 'আগ্রাসী' মুসলমান শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের রক্ষা করছে। ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ নৌবহর তাদের নিজ নিজ স্বার্থের ডাকেই পরস্পরের সাথে একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরা বানদা দ্বীপ থেকে তাদের মসলাপাতি ক্রয়ের "অধিকারের" ওপর জোর দিতে থাকে। তারা সেখানে দুর্গ নির্মাণ করে এবং ওয়াই, রুন ও লনথর দ্বীপের শাসকদের সাথে মৈত্রী ও প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে। এই অঞ্চলের অবস্থা ওলন্দাজদের জন্য দুঃসহ করে তোলার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা ওলন্দাজ ও বানটাম-এর মুসলিম শাসকের মধ্যে এক বড় ধরনের সংঘর্ষে উস্কানী দেয়। ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিজের গভর্ণর জেনারেল জান পি. কোয়েন মলুক্কাস দ্বীপমালা, এ্যামবয়না দ্বীপ ও বানদা দ্বীপমালার সাথে মসলার একচেটিয়া ব্যবসা রক্ষা করাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নেন। তাই তিনি ১৬১৯-১৬২১ সালে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিজ কোম্পানির সকল নৌবহরকে নিয়োগ করেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তিনি এজন্যে এমন কি জাভা এবং ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিজের নতুন রাজধানী বাটাভিয়াকে পর্যন্ত হারানোর ঝুঁকি নেন: ব্রিটিশদের উস্কানীতে ঐ যুদ্ধের সময় বানটাম-এর সুলতান জাভা আক্রমণ করে বসেন।

ব্রিটিশ নৌবহরের সাথে একের পর এক নৌযুদ্ধের শেষে ১৬২১ সালে জান পি. কোয়েন বানদা দ্বীপমালা দখলে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। দ্বীপমালার শাসকবর্গ আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়। ১৬২১ সালে ওলন্দাজরা তাই লনথর ও ওয়াই দ্বীপের হাজার হাজার মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করে। একই বছরে তারা বানদা দ্বীপের সকল অধিবাসীকে দ্বীপছাড়া করার ভুতুড়ে পরিকল্পনা নেয়। দ্বীপবাসীদের অপরাধ, তারা ব্রিটিশদের এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছিল যে ব্রিটিশরা "দ্বীপে ইসলাম রক্ষা করবে।" সমসাময়িক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ডি. জি. ই. হল তাঁর "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস" শীর্ষক বইতে লিখেছেন যে ওলন্দাজরা তাদের ওই পরিকল্পনা দানবীয় নৃশংসতার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করে। যেসব মুসলমান কোন রকমে প্রাণে বেঁচে যান তাঁদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং জাভায় বসবাসকারী ওলন্দাজ প্রভুদের কাছে চালান করা হয়। জাভা থেকে হাজার হাজার মুসলমানকে তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করে বানদা দ্বীপমালায় নিয়ে আসা হয়। তাদেরকেও দাসে পরিণত করা হয় এবং নতুন ঔপনিবেশিক প্রভু ওলন্দাজদের মালিকানাধীন জায়ফল বাগানে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। এই দুঃস্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে ডি. জি. ই. হল খোদ ওলন্দাজ ইতিহাসবিদ কোলেন ব্রানডার-এরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ

"এই সমস্ত প্রক্রিয়ায়, যা স্মৃতিকে কলঙ্কিত করে রেখেছে, কোয়েন এমন অমানবিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন যে এমন কি কোম্পানির কর্মচারীরা পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।"

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য বানদা দ্বীপমালার অধিবাসীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার পর নেদারল্যান্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকরা আমবোয়ানা দ্বীপ থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই দ্বীপে ব্রিটিশরা ইতিমধ্যেই একটা বেশ সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। ১৬২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওলন্দাজরা এই ব্রিটিশ বাণিজ্য কেন্দ্রের সব কর্মকর্তাকে হঠাৎ করে গ্রেফতার করে বসে। আটককৃত কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল ১৮ জন ইংরেজ, ১১ জন জাপানী আর ১ জন পর্তুগীজ। ওলন্দাজদের একটি দুর্গ, ভিক্টোরিয়া ক্যাসেল দখল করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে। আটককৃত কর্মকর্তাদের ওপর নানাবিধ নির্যাতন চালিয়ে তাদের কাছ থেকে "স্বীকারোক্তি" আদায় করা হয়। ১০ জন ইংরেজ, ১০ জন জাপানী ও পর্তুগীজ কর্মকর্তাকে বিচারে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় এবং তাদের মস্তক ছিন্ন করে ঐ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। এই ঘটনা ইতিহাসে "আমবোয়ানা হত্যাকান্ড" নামে পরিচিত হয়ে আছে। ব্রিটিশরা শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় তাদের বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

১৬৪১ সালে ওলন্দাজরা দুই মুসলিম সালতানাৎ, জোহোরম ও মালাক্কার মধ্যে বিরোধ উস্কে দেয় এবং সেই সুযোগে পর্তুগীজদের মালাক্কা থেকে উঠিয়ে দিয়ে মালাক্কা দখল করে নিতে সমর্থ হয়। এর পর প্রায় দুই শত বছর ধরে ব্রিটিশরা তাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিজয়ের পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নের সুযোগ নিতে পারেনি।

তাই ব্রিটিশরা মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর অঞ্চলে তাদের অবস্থান জোরদার করার জন্যে বিশেষভাবে উঠে-পড়ে লাগে। এইভাবে তারা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথটি ইউরোপ থেকে আটলান্টিক দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারত মহাসাগর হয়ে ভারতের উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথটির অংশবিশেষ জলভাগের ওপর দিয়ে এবং অংশবিশেষ স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রসারিত। পারস্য উপসাগর হয়ে তারপর অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন কয়েকটি আরব দেশের ভূভাগ পেরিয়ে, এবং লোহিত সাগর ও মিশর হয়ে গিয়েছে এই বাণিজ্যপথ। এই বাণিজ্যপথের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা এই অঞ্চলে আলবুকারেকের সময় থেকে কায়েমী হয়ে বসা পর্তুগীজদের উৎখাতের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সপ্তদশ শতকের শুরুতে পারস্যের শাসক সাফাভিদ রাজবংশের প্রথম শাহ আব্বাস পারস্য উপসাগরে তাঁর অবস্থান জোরদার করার চেষ্টা করেন।

এই উদ্দেশ্যে পারস্যের রাজদূত ও কূটনীতিকগন পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁদের সম্ভাব্য অভিযানে মিত্র অনুসন্ধান শুরু করেন।

এই পরিস্থিতিতে, সুযোগ বুঝে, ব্রিটিশরা তাদের মিত্রশক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়।

ঐ একই সময়ে প্রথম শাহ আব্বাস পারস্য উপসাগরে তোমরুন শহরের কাছে, হরমুজ দ্বীপের ঠিক উল্টোদিকে, একটি নতুন বন্দর গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। শাহ-এর নাম অনুসারে এই বন্দরের নাম দেয়া হয় বন্দর আব্বাস। ১৬২০ সালের দিকে এসে এক বিশাল পারসিক সেনাবাহিনী এই বন্দরে মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি, শিরাজ ও ইস্পাহানে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূতদের সাথে গোপন আলাপ আলোচনা চলতে থাকে একটি সামরিক রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদনের প্রশ্ন নিয়ে। পারস্য উপসাগর থেকে পর্তুগীজদের হটিয়ে দেয়ার বিষয়টিই ছিল এই চুক্তির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ১৬২২ সালের নভেম্বরে এই চুক্তির দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে পারসিক সেনাবাহিনী ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৌবহর যৌথভাবে পরিচালনার বিধান সন্নিবেশিত হয়। লক্ষ্য ছিল পর্তুগীজ নৌবহরকে পরাজিত করা, হরমুজ দ্বীপে পারসিক সেনা-বাহিনী অবতরণ করিয়ে স্থানীয় পর্তুগীজ দুর্গ দখল করা এবং হরমুজ ও সকল শহর ও জায়গা থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করা।

পারস্য উপসাগরে প্রাধান্য বিস্তারের ব্রিটিশ লালসা এই চুক্তির শর্ত বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট ধরা পড়ে। হরমুজ থেকে পর্তুগীজরা বিতাড়িত হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কি কি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় চুক্তির দলিলে। শুধু হরমুজে নয়, বন্দর আব্বাসেও অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ ও অধিকার এর অন্যতম। ব্রিটিশরা এমনকি হরমুজে আদায়কৃত শুল্ক রাজস্বের অর্ধেকও দাবি করে বসে। সেই সময়ে হরমুজ ছিল একাধিক ইউরোপ-এশিয়া বাণিজ্য পথের সংযোগস্থল এবং মাল ওঠানো-নামানোর কেন্দ্র।

পারস্য উপসাগর অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী আরবদের ওপর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শোষণের শুরু ১৮২০ সাল থেকে। ঐ বছরে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা ৫টি আরব সালতানাতের (এই পাঁচটি সালতানাং নিয়েই এখন গঠিত হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত) শেখদেরকে কুখ্যাত সাধারণ চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে। তবে, উপরে উল্লিখিত ১৬২২ সালের ইঙ্গ-পারস্য চুক্তির ধারাসমূহ

থেকে দেখা যায় যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালিকরা ১৮২০ সালে সম্পাদিত সাধারণ চুক্তিরও ২০০ বছর আগে থেকে পারস্য উপসাগরের মুসলমানদের শোষণ করা শুরু করে।

১৬২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ নৌবহরের সাহায্যে বন্দর আব্বাসে সমবেত পারসিক সৈন্যদের হরমুজে অবতরণ শুরু হয়। একই সাথে ব্রিটিশ নৌবহর থেকে পর্তুগীজ নৌবহরের ওপর গোলা-বর্ষণও শুরু করা হয়। ১৬২৩ সালের এপ্রিলে পর্তুগীজদের পতন ঘটে এবং হরমুজ দ্বীপকে পারস্যের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে সেই থেকে এই দ্বীপে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের একটা বিরাট অংশও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালিকদের পকেটে যেতে থাকে।

পারস্য উপসাগর থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করার পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুচতুর বণিকরা পারস্যের সাফাভিদ শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং জাসুক, শিরাজ, ইস্পাহান ও বন্দর আব্বাসে ব্যবসায়িক ঘাঁটি স্থাপন করে। একই সাথে তারা পারস্য সিল্ক রপ্তানির একচেটিয়া ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাদের পুরনো পরিকল্পনাও এগিয়ে নিতে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য তারা সাফাভিদ পারস্যের (সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এসে সামন্ত কলহ ও সংঘর্ষের ফলে সাফাভিদ রাজবংশ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে) কাছ থেকে যতটা নয়, তার চেয়েও বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তাদের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে। ব্রিটিশদের অদম্য লালসার কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান ইঙ্গ-পারস্য বিরোধের সুযোগ নিয়ে ওলন্দাজ বণিকরা শাহ-এর দরবার থেকে বন্দর আব্বাসে ব্যবসায়িক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি লাভে সমর্থ হয়। তারপর তারা লাভজনক পারস্য সিল্কের ব্যবসায় হাত দেয়। মলুক্কাস থেকে আনা মশলাপাতির বিনিময়ে তারা পারস্য সিল্ক সংগ্রহ করতো। ফলে এই সিল্কের ব্যবসায় তাদের মুনাফা হতো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, ওলন্দাজরা প্রতিবছর গড়ে ৭০০ টন মশলাপাতি পারস্যে নিয়ে এসে তার বিনিময়ে সিল্ক ক্রয় করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে। এতে তাদের লাভ হয় গড়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড (বর্তমান মূল্যমানে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড)।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে টন কে টন মশলাপাতি

ছিল না। তাছাড়া, ওলন্দাজরা তাদের সিল্কের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে চালানোর উদ্দেশ্যে পারস্যের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে নানাবিধ উপঢৌকন দিয়ে হাত করারও চেষ্টা করে। লন্ডন তখন পারস্য উপসাগর এলাকায় ওলন্দাজদের ব্যবসা বাণিজ্য খর্ব করার জন্যে অন্য পথ ও উপায় গ্রহণ করে। অটোমান সাম্রাজ্য ও পারস্যের মধ্যকার বিরোধের সুযোগ নিয়ে এবং বাগদাদে নিযুক্ত পর্তুগীজ ও তুর্কী ভাইসরয়ের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে ব্রিটিশরা বসরায় তাদের ব্যবসায়িক ঘাঁটি স্থাপনে স্থানীয় তুর্কী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি লাভে সক্ষম হয়।

বসরায় ব্যবসায়িক ঘাঁটি স্থাপন করে ব্রিটিশরা সিল্ক ও মশলাপাতির ব্যবসায় হাত দেয়। পাশাপাশি তারা তুর্কী ও পারসিকদের মধ্যে, আরব শেখ ও তুর্কী পাশাদের মধ্যে, আরব উপজাতি প্রধান ও পারস্যের শাহ-এর মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ উস্কে দেয়ার ষড়যন্ত্রে নানাবিধ কূট তৎপরতা চালাতে শুরু করে।

এইভাবে ব্রিটিশরা তাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস ও পারস্য উপসাগর বিধৌত এলাকার দেশ ও জাতিসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হস্তক্ষেপের সূচনা ঘটায়। এবং এটা চলে প্রায় পরবর্তী সাড়ে তিনশ' বছর ধরে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম প্রাচ্যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ

১. হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭১৭ সালে সম্রাট ফাররুখ শিয়রের কাছ থেকে ফরমান লাভ করে। তারপর সম্পদশালী বাংলায় আসন গেড়ে বসার উদ্দেশ্যে তারা স্থানীয় নবাবের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার পক্ষে দাঁড়ায়। একই উদ্দেশ্যে তারা হিন্দু-মুসলিম বিরোধ জাগিয়ে তুলতেও সচেষ্ট হয়।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় নানাবিধ কারণে।

প্রথমত, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে, শুধুমাত্র হিন্দুস্থানের অন্যান্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশের জন্যই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে অনুপ্রবেশের জন্যেও বাংলাদেশকে ঘাঁটি হিসেবে কাজে লাগানোর স্ট্র্যাটেজিক সুবিধা।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ তখন ছিল উচ্চহারে মুনাফা অর্জনের এক অফুরন্ত উৎস। লুণ্ঠনাত্মক যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ব্রিটিশদের তখন খুবই প্রয়োজন এই মুনাফার। তাছাড়া, বাংলার উপর ভর করে সারা হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাবনাও ব্রিটিশদের বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট করে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশ তখন ছিল উন্নতমানের সুতীবস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। তাঁর "ভারত সন্ধানে" পুস্তকে জওয়াহেরলাল নেহরু যেমন লিখেছেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় উৎপাদিত সুতীবস্ত্র ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানের। ব্রিটিশ ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সুতীবস্ত্রের বিরাট বাজার লাভ করে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশসমূহে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় বাংলার সুতীবস্ত্রের চাহিদা আগে থেকেই ছিল। সুতীবস্ত্রের ব্যবসা এই অঞ্চলে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক শক্তি জোরদার করার একটা বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করে। উন্নতমানের এই সুতীবস্ত্র তৈরী করতো প্রধানত বাংলার মুসলমান বয়নশিল্পীরা, বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান রাজধানী ঢাকা ও তার আশেপাশের তাঁতী সম্প্রদায়।

চতুর্থত, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা বাংলায় আফিমের চাষও শুরু করে। এই আফিম দূরপ্রাচ্যে, বিশেষ করে চীনে রপ্তানি করে ব্রিটিশরা প্রচুর মুনাফা লাভ করতো। এসব ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এশিয়ার অন্যান্য দেশেও অনুপ্রবেশ করে। এ কারণেই, ১৭৭৩ ও ১৭৯৭ সালে, ভারতে নিযুক্ত প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এক ডিক্রি জারী করে পপি চাষ ও আফিম ক্রয় বিক্রয়ের উপর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ঘোষণা করেন। কোম্পানি বাংলার মুসলমান কৃষকদের আফিমের জন্যে পপির চাষ করতে বাধ্য করে। এই আফিম, আমরা সবাই জানি, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, এশিয়ার কোটি কোটি লোককে বুঁদ করে রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীন বাংলা থেকে আফিম আমদানি রোধ করার জন্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দুই দুইটি যুদ্ধ করে। এখানে এটা উল্লেখ করা যথোপযুক্ত হবে যে, চীনে অনেকেই তখন মনে করতো যে আফিম আসক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ চীনা মানুষের মৃত্যুর জন্য বাঙালীরাই দায়ী।

এভাবেই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের নীতি এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বল বাড়তে থাকে। বাংলার নবাবদের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে সমর্থন দান করে কোম্পানি তার রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করতে থাকে। কাগজে কলমে বাংলা তখনো মুঘল সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দু বণিক ও কুসীদজীবীদের—যেমন উমিচাঁদ ও জগৎ শেঠ—সাথে সক্রিয় যোগসাজসে বাংলাকে তখন অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা হচ্ছিল। কোম্পানি সুতীবস্ত্র ও আফিমের ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা এবং রাজস্ব আদায়ের অর্থের

একটা অংশ নবাব ও তার কোটারিকে উপঢৌকন দিয়ে হাত করবার চেষ্টা করে। এটা করে কোম্পানি নবাবের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে সমর্থ হয়। হিন্দু বণিক ও কুসীদজীবীরাও কোম্পানির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে খুবই আগ্রহী ছিল। কোম্পানি ইতিমধ্যেই এসব বণিক ও কুসীদজীবীদের মুসলমান কৃষকদের রোষের হাত থেকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে ফেলে। বণিক ও কুসীদজীবী সম্প্রদায়ের নির্বিচার লুণ্ঠনের ফলে মুসলমান কৃষক ও সামন্ত প্রভুরা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় ক্ষমতার যে পিরামিড গড়ে তোলে তার ফলে দেশের প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষতি-সাধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়, সাধারণ মানুষের উপর শোষণ তীব্রতর হতে থাকে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বেড়ে যায়।

এই পর্যায়ে অবশ্য দাক্ষিণাত্যে ঘাঁটি গেড়ে বসা ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিরোধের ফলে ব্রিটিশদের অবস্থা কিছুটা দুর্বলও হয়ে পড়তে থাকে। অবস্থাটা আরো জটিল হয় পশ্চিম ও মধ্য ভারতের হিন্দু শাসনক্ষমতা মারাঠা রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে। লন্ডনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ এবং মাদ্রাজ ও কলকাতায় তার এজেন্টরা তাই বাংলার ব্রিটিশ শাসন সংহত করার উদ্দেশ্যে একাদিক্রমে রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের অবস্থান দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা তাদের অনুগত মহম্মদ আলীকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সমর্থন করে। ১৭৫৪ সালে কোম্পানি মহম্মদ আলীকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্নাটকের নবাব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর চার বছর পর, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টরা তাদের অনুগত নাজির জং-কে প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত হায়দ্রাবাদের নিজাম (শাসক) বানাতে সমর্থ হয়। ফলে মাদ্রাজ ও কলকাতার ওপর ফরাসী হামলার আশংকা থেকে ব্রিটিশরা অনেকটা নিরাপত্তা লাভ করে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সেনা ও নৌবাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৬৪৬ সালের দিকে এসে ব্রিটিশরা স্থানীয়ভাবে লোক সংগ্রহ করে সেনা ইউনিট গঠন করা শুরু করে। এইভাবেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গড়ে তোলে তার সিপাহী বাহিনী। এই বাহিনী ভারতকে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশকে

ব্রিটিশদের করায়ত্তে আনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জাতিগত ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয় এই বাহিনী। যেমন হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের নিয়ে আলাদা আলাদা বাহিনী। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুবাহিনী আর হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিম বাহিনী মোতায়েন করা হতো।

কর্নাটক ও হায়দ্রাবাদে নিজেদের অবস্থান জোরদার করার ব্রিটিশ পদক্ষেপ, স্বাভাবিকভাবেই, হিন্দু মুসলিম বিরোধ আরো তীব্রতর করে।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর (অনেক কাল ধরে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে আসছিলেন) বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তীব্র মতবিরোধ ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় জয়ী হন সিরাজউদ্দৌলা, আলীবর্দী খানের পৌত্র। তিনি বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতারোহনের প্রতিযোগিতায় সিরাজউদ্দৌলাকে সমর্থন-দানকারী সামন্ত গোষ্ঠী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা খর্ব করার দাবি তোলে। এদিকে, কোম্পানির এজেন্টরা তাদের অনুগত শওকত জং-কে কলকাতায় পালিয়ে চলে আসতে রাজী করায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তীতে সিরাজউদ্দৌলা-র বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাকে সুযোগ মতো কাজে লাগানো। নবাব কলকাতা থেকে শওকত জংকে মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠানোর দাবি জানালে কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে নবাবের সাথে কোম্পানির সংঘর্ষাবস্থা সৃষ্টি হয়। নবাবের বাহিনী দেরি না করে কলকাতা দখল করে নেয়। যুদ্ধে এবং যুদ্ধ শেষে কলকাতা থেকে পলায়নের সময় ৮৬ জন ব্রিটিশ কর্মকর্তা নিহত হয়। নবাবের সৈন্যরা ৬০ জন ব্রিটিশকে বন্দী করে এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে আটকে রাখে। পর্যাপ্ত আলোবাতাসের অভাবে এবং প্রচন্ড গরমে বন্দীদশার প্রথম রাতেই ৩৭ জন ব্রিটিশ বন্দী মারা যায়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা এই দুঃখজনক ঘটনাকে সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেয় "মুসলিম সন্ত্রাসের" বিরুদ্ধে ব্রিটিশ জনমত গড়ে তোলার সুযোগ হিসেবে (ফোর্ট উইলিয়ামের কারাকক্ষের এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনাকে ব্রিটিশদের কাগজপত্রে "কলকাতার অন্ধকূপ হত্যা" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে)।

কোম্পানির ডাইরেক্টরদের নির্দেশে, কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা ব্রিটিশ কর্মকর্তা হলওয়েল ব্রিটিশদের হত্যার এক বানোয়াট কাহিনী

প্রচার শুরু করেন। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রচার করেন যে ৬০ জন নয়, ১৪৬ জন ব্রিটিশকে কারাকক্ষে আটক করা হয়েছিল। তাই, "নরঘাতক মুসলমানরা" ৩৭ জন নয়, ১০৯ জন ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে হত্যার দায়ে অপরাধী। হলওয়েল মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা ৩৭-এর সাথে আরো ৮৬ যোগ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ৮৬ জন যুদ্ধের সময় এবং কলকাতা থেকে পালাতে গিয়ে নিহত হয়।

উপনিবেশবাদীদের মিথ্যা প্রচারণার মুখোশ উন্মোচন করে কাল মার্কস লিখেছিলেন যে যেসব ব্রিটিশরা জীবিত ছিলেন তাঁদেরকে হুগলি নদী পার হয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। অথচ এ ঘটনাকেই 'কলকাতার অন্ধকূপ হত্যা' বলে ব্রিটিশ ভন্ডরা এখনো পর্যন্ত এতো কুৎসা রটনা করে চলেছে।

বাংলার নবাবের "আগ্রাসনমূলক" কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে অযথা উত্তেজনা ঘনিয়ে তুলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা নবাবের সাথে যুদ্ধ করার জোর প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারা সন্ধির সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। লন্ডন যতো শীঘ্র সম্ভব বাংলা জয় করার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ ফরাসীদের সাথে আর একটা যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠছিল। ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনী বাংলার নবাবের বাহিনীর সাথে যোগ দিতে পারে এরকম আশংকাও করছিল ব্রিটিশরা। তাছাড়া, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হিন্দুস্থানের ঐ সময়কার বৃহত্তম বাহিনী, মারাঠা বাহিনীর বাংলা আক্রমণের আশংকাও প্রবল হয়ে উঠছিল।

কোম্পানি তাই মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে অবিলম্বে কলকাতায় বাহিনী প্রেরণ করে। যেহেতু সৈন্য বাহিনী প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল না, তাই তারা তাদের বহু পরীক্ষিত উৎকোচ প্রদান ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। উমিচাঁদ ও জগৎশেঠের মাধ্যমে কোম্পানির এজেন্টরা নবাবের সেনাপতি ও উজির মীর জাফরের সাথে গোপন যোগাযোগ গড়ে তোলে। ব্রিটিশরা মীর জাফরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তিনি যদি যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত তাঁর সৈনিকদের এক বিরাট অংশকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করেন, বাংলা থেকে ব্রিটিশদের সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতাড়নের কথা দেন এবং কোম্পানিকে নতুন সুযোগ-সুবিধা ও "বাঙালীদের হাতে কলকাতা ধ্বংসের" ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন তাহলে তাঁকে বাংলার সিংহাসনে বসানো হবে। মীর জাফর শর্ত মেনে নেন এবং একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে গ্যারান্টিদাতা হিসাবে আরো স্বাক্ষর

দেন তৎকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী জগৎশেঠ। মীর জাফর, জগৎ-শেঠ ও ব্রিটিশ কমান্ডার রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন উমিচাঁদ। ব্রিটিশদের কপটতা সম্পর্কে সজাগ চতুর উমিচাঁদ দাবি করেন যে স্বাক্ষরিতব্য চুক্তিতে এই মর্মে একটা ধারা থাকতে হবে যে "মধ্যস্থতা ও বিপদের ঝুঁকি" গ্রহণের বিনিময়ে তাকে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।

রবার্ট ক্লাইভ এইসব শর্ত মেনে নেন। কিন্তু তিনি বাংলায় কোম্পানির প্রধান এজেন্টের জাল স্বাক্ষর সম্বলিত চুক্তির একটি ভুঁয়া দলিল উমিচাঁদকে দেখান। মীর জাফরের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির দলিল সিলমোহর করে হস্তান্তর করা হয় (মীর জাফরকে চুক্তির প্রকৃত পাঠই দেখানো হয়েছিল)। উমিচাদ শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুত অর্থ থেকে বঞ্চিত হন।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন কলকাতার উত্তরে পলাশীতে ব্রিটিশ-দের সাথে বাংলার নবাবের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবাবের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৫০, ০০০ পদাতিক ও ১৮০০০ অশ্বারোহী সৈন্য। রবার্ট ক্লাইভের বাহিনীতে ছিল ৩০০০ সৈন্য, যার মধ্যে মাত্র ৮০০ জন ছিল ইউরোপীয়। কিন্তু, গোপন চুক্তি অনুযায়ী মীর জাফর যুদ্ধ থেকে তাঁর বাহিনীর মূল অংশকে প্রত্যাখ্যান করে নিলে ক্লাইভের বাহিনী কামানের লড়াইয়ে সহজেই নবাবের বাহিনীকে পরাস্ত করে।

পলাশীর যুদ্ধের পর, মীর জাফর, বাংলার নবাব হলেও বাংলার প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় রবার্ট ক্লাইভের হাতে। ব্রিটিশ উগ্র জাতিয়তা-বাদী ও উপনিবেশবাদীদের কাছে ক্লাইভ একজন বীর হিসেবে পূজনীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এমন কি বর্তমানেও, ব্রিটিশ পাঠ্যপুস্তকে ও জন-প্রিয় সাহিত্যে 'সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা' ও 'একজন দক্ষ সমরবিদ' হিসেবে ক্লাইভের গুণগান করা হয়ে থাকে। পলাশীতে মাত্র ৩০০০ সৈনিক ও অফিসার নিয়ে ৭০০০০ সৈন্যের বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়ে থাকে। প্রায় দুইশ' বছর ধরে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার জাতিসমূহকে শুনিয়ে এসেছে যে "পলাশীর বিজয়" এশিয়ান ও আফ্রিকানদের, বিশেষ করে মুসলমানদের তুলনায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছে (যদিও এটা বেমালুম ভুলে যাওয়া হয় যে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ৩০০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৮০০ জন ছিল ব্রিটিশ)। অধিকাংশ

ব্রিটিশ লেখকই ঐ যুদ্ধে বিজয়ের জন্যে যে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয়েছিল সেটা "ভুলে যেতেই" ভালবাসেন।

বাংলার সিংহাসনে আরোহনের সঙ্গে সঙ্গেই মীর জাফর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দান ও নানাবিধ উপঢৌকন প্রদানে এগিয়ে আসেন। তাঁর পূর্বসূরী কর্তৃক কলকাতা ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশের বর্তমান মূল্যমানে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা) প্রদান করেন, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে শহরের ক্ষয়ক্ষতি খুব সামান্যই হয়েছিল। নবাবের কাছ থেকে রবার্ট ক্লাইভ পান ২০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা উপঢৌকন হিসেবে। মীর জাফর কোম্পানির কর্মকর্তা এবং ব্রিটিশ স্থল ও নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের উপঢৌকন দেন ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

ব্রিটিশদের উপঢৌকন প্রদানের জন্যে সীমাহীন করারোপ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে শুধু বাংলার কৃষকরাই নয়, সামন্ত প্রভুরাও মীর জাফরের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর সুযোগ নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সির নতুন গভর্নর (কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান এজেন্টের সরকারী পদবী) ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ সালে মীর জাফরকে নামিয়ে তাঁর জায়গায় তাঁর জামাতা মীর কাসিমকে বাংলাদেশের নবাবের পদে আসীন করেন। মীর কাসিম গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের ২ লক্ষ পাউন্ড (বর্তমান মূল্যমানে ২ কোটি পাউন্ড) প্রদান করেন এবং বাংলার তিনটি সম্পদশালী অঞ্চল কোম্পানিকে উপহার দেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক কৃষক ও হস্তশিল্পীদের ওপর নির্বিচার শোষণও পাশাপাশি অব্যাহত থাকে। নতুন নতুন কর আরোপ করা হয় এবং স্থানীয় বণিকদের ওপর নেমে আসে অর্থনৈতিক শোষণ। এ সবের ফলে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের মনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্যে মীর কাসিম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানে মনস্থির করেন। এই লক্ষ্যে তিনি ১৭৬৩ সালে উত্তর ভারতীয় রাজ্যের মুসলিম নবাব এবং মুঘল সাম্রাজের শাসক দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলেন।

ব্রিটিশরা বিদ্রোহ দমন করে। নবাবের বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সেনাধিনায়কদের উৎকোচ দিয়ে নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার

পথে টেনে আনে। ফলে মিত্রশক্তির ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৭৬৪ সালে সংঘঠিত হয় বক্সারের যুদ্ধ। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী এক নিদারুণ পরাজয় বরণ করে। ক্লাইভ, তখন বাংলা প্রেসিডেন্সির গভর্নর, আবারো বয়োবৃদ্ধ মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসান। মীর জাফর তখন ব্রিটিশদের হাতের পুতুল।

দ্বিতীয় শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করে ক্লাইভ তাঁকে জোরপূর্বক বাধ্য করেন বাংলার দিওয়ানী, অর্থাৎ বাংলার অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে এক ফরমান জারী করতে। ফলে বাংলায় উদ্ভব ঘটে এক দ্বৈত প্রশাসনের। মীর জাফরের অধীনে বাংলার কর্তৃপক্ষের উপর সাধারণ রাজকাজ পরিচালনার দায়িত্ব, আর কর আদায়ের সরকারী দায়িত্ব কোম্পানির কর্মচারীদের। এর অর্থ যা দাঁড়ালো তা হলো, এখন থেকে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে যথেচ্ছ শোষণের সুযোগ পেয়ে গেল ব্রিটিশরা।

কর আদায়ে ও শোষণে ব্রিটিশরা ছিল সিদ্ধহস্ত। ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা বাংলা থেকে পণ্য ও অর্থের আকারে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড (বর্তমান মূল্যমানে প্রায় ৪০০ কোটি পাউন্ড) আদায় করে। দেশটিকে তারা ঠেলে দেয় ধ্বংসের কিনারায়। বাংলায়, ১৭৭০ সালে, ফসলহানি ঘটায় দেখা দেয় চরম দুর্ভিক্ষ। ঐ দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় কোটি লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করে। ১৭৭২ সালে, বাংলার নতুন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস লন্ডনে সরকারীভাবে রিপোর্ট পাঠান যে বাংলার কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যাওয়ার ফলে আবাদী জমি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ১৭৭১ সালে যে পরিমাণ কর আদায় হয়েছে তা ১৭৬৮ সালে আদায়কৃত করের পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে বাংলার ঐ দুর্ভিক্ষের পেছনে কোম্পানির কর্মচারী-দেরও হাত ছিল। তারা খাদ্যশস্য মজুদ করে রেখে পরে তা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে। এইভাবে বহু ব্রিটিশ কর্মচারী ও বণিক প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়।

বাঙালীদের মধ্যে তখন কি ঘটছিল? বাঙালীরা ব্রিটিশ শাসন সহজে মেনে নিতে পারেনি। বাংলার সামন্ত প্রভু ও মুসলমান ধর্মীয় নেতারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, একাধিকবার বিদ্রোহ করেন। কিন্তু প্রতিবারই সেই বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমনও করা হয়। বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা হিন্দুদের নিয়ে গঠিত সিপাহী ইউনিটকে

কাজে লাগায়।

আগেই বলা হয়েছে, পশ্চিম ও মধ্যভারতে হিন্দু মারাঠা রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামনে এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মারাঠারা একাধিকবার উত্তর বাংলায় আক্রমণ চালায়। নিজেদের অবস্থান জোরদার করার জন্যে এবং একই সাথে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক শত্রুকে দুর্বল করে ফেলার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টরা পশ্চিম ও মধ্যভারতের পরিস্থিতির দিকে নজর দেয়। তারা বুঝতে পারে যে মারাঠারা তাদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপর ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতে পারে। ব্রিটিশরা তাই মারাঠাবিরোধী একটি রাজ্যকে নিজেদের দলে ভেড়াবার জন্যে উঠেপড়ে লাগে।

"ভারত সন্ধানে" পুস্তকে জওহরলাল নেহরু ব্রিটিশদের সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"ইতিহাসবিদরা যেমন বলেছেন, তাদের (ব্রিটিশদের—লেখক) গুপ্তচর ব্যবস্থা ছিল নিপুণ। শত্রুপক্ষের রাজ দরবার ও সেনাবাহিনীর অবস্থা সম্পর্কিত পুরো তথ্য তাদের হাতে ছিল। অপরদিকে ব্রিটিশদের শত্রুপক্ষের কোনো ধারণাই ছিল না ব্রিটিশরা কি করছে বা করতে যাচ্ছে। ব্রিটিশদের পঞ্চম বাহিনী নিরলস কাজ করে গেছে, এবং সংকটের সময়ে, যুদ্ধের ময়দানে ব্রিটিশদের পক্ষে দলত্যাগের ঘটনা ঘটেছে বহুবার। এর ফলে পরিস্থিতিই পাল্টে গেছে আমূলভাবে। অধিকাংশ যুদ্ধই তারা লড়াইয়ের আগেই জিতে যায়। পলাশীতেও তাই-ই ঘটে। শিখ যুদ্ধ পর্যন্ত এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বার বার।"

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করে তোলার জন্যে মুঘল দরবারে তাদের এজেন্ট নিয়োগ করে। ব্রিটিশরা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে মারাঠারা বাধ্য হয় বাংলা ও মধ্য ভারতের সীমান্ত থেকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নিয়ে উত্তর ভারতে অভিযান চালাতে। ঐ অভিযানে, ১৭৫৮ সালে দিল্লী ও লাহোর মারাঠাদের প্রভাবে চলে যায়। পাঞ্জাবে বিশাল মারাঠা বাহিনীর উপস্থিতি, ব্রিটিশ যেমন আশা করেছিল, আফগানিস্তান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ শাহ দুররানীর সাথে মুঘলদের সংঘর্ষাবস্থা সৃষ্টি করে। ১৭৪৮-১৭৫৮ সালের মধ্যে আহমেদ শাহ

দুররানী পাঞ্জাব দখলের জন্যে চার চারবার অভিযান চালান।

মারাঠারা পাঞ্জাবে উপনীত হলে, ১৭৫৮ সালে আহমেদ শাহ দুররানী "বিধর্মী" মারাঠাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ও মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে উত্তর ভারতের মুসলিম শাসকদের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আহমেদ শাহ দুররানী সম্পর্কে অনেক খোঁজ-খবরই রাখতো। আহমেদ শাহ দুররানী, আহমেদ খান নামে যখন ইরানের শাসক নাদির শাহ-এর সেনাবাহিনীতে জেনারেল ছিলেন তখন, ১৭৩৯ সালে, তিনি মেশেদ-এ নাদির শাহের সদর দপ্তরে ব্রিটিশ মাসকোভি কোম্পানির এজেন্ট এলটনের সাথে দেখা করেন। পরেও ব্রিটিশরা আহমেদ খানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। তিনি মারাঠা সেনাবাহিনী সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ব্রিটিশদের কাছ থেকে লাভ করেন।

১৭৫১ সালের ১৪ই জানুয়ারি, পানিপথে এক প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে আহমেদ শাহ দুররানী মারাঠা সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাভূত করেন। এর ফলে বহু বছরের জন্যে ব্রিটিশরা মারাঠা-দের হুমকি থেকে রক্ষা পায়। তবে, পানিপথের ঐ যুদ্ধে উত্তর ভারতের মুসলিম মিত্রবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুঘল সাম্রাজ্য আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস লিখেছেন:

"মুঘলদের কেন্দ্রীয় শক্তিকে ভেঙে ফেলছিল মুঘল সুবেদাররা। সুবেদারদের শক্তিকে খর্ব করছিল মারাঠারা। আবার মারাঠাদের ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছিল আফগানরা। আর এভাবে যখন সকলেই একে অপরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত, সেসময়ে ব্রিটিশরা এলো মঞ্চে, এবং এর ফলে তারা সমর্থ হলো সকলকেই বশীভূত করতে।"

দেখা যাচ্ছে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশ-বাদীরা বাংলায় যে নীতি অনুসরণ করেছে তার পরিণতিতে শুধু বাংলার ধনসম্পদই লুন্ঠিত হয়নি আর লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্র্য বরণ করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যায় নি, একই সাথে হিন্দুস্থানের পরিস্থিতিও জটিল হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ নীতি ভারতের হিন্দু ও মুসলিম রাজ্যগুলোর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ জিইয়ে রেখেছে। এই নীতি ভারতকে ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে ব্রিটিশ উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করার ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে পারস্যের সাফাভিদ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। ১৭২২ সালে, আফগান সেনাবাহিনী এক দীর্ঘ-স্থায়ী অবরোধের পর পারস্যে সেসময়ের রাজধানী ইস্পাহান দখল করে নেয়। একই সময়ে পারস্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল চলে যায় তুর্কীদের কবলে। পারস্যে ব্রিটিশ প্রভাবও কমে আসে। পারস্য সিল্ক রপ্তানি ব্যবসার উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং পারস্য উপসাগরের পূর্ব উপকূলে নিজেদের অবস্থান জোরদার করার কাজে সাফাভিদ রাজবংশকে ব্যবহার করার ব্রিটিশ পরিকল্পনা ভেঙে পড়ে।

এরই মধ্যে আবার, ১৭৩০-এর দশকের প্রথম দিকে, আফগানরা পারস্যের ভূখন্ড থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। পারস্য ঐক্যবদ্ধ হয় নাদির শাহের নেতৃত্বে। নাদির শাহ পারস্য উপসাগরের পূর্ব ও উত্তর উপকূলে পারস্য প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেন।

ফলে, স্বাভাবিকভাবেই, নাদির শাহের সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে, লন্ডন ও কলকাতা প্রচেষ্টা নেয় নাদির শাহকে ভারত আক্রমণে যথাসম্ভব প্রলুব্ধ ও সাহায্য করতে। ব্রিটিশরা এই সিদ্ধান্ত নেয় এমনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে নাদির শাহের আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ফলে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থান জোরদার করা সহজ হবে। নাদির শাহের ভারত অভিযান হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারেরও সুযোগ করে দেবে।

১৭৩৯ সালেই, অর্থাৎ নাদির শাহের ভারত আক্রমণের আগেই, জন এলটন পারস্যের শাসকের কাছে শুধু পারস্য উপসাগরের জন্যে নয়, কাস্পিয়ান সাগরের জন্যেও এক বিশাল নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন।

দেড়শত বছর পর, ১৮৯৯-১৯০৫ সালে ভারতের ভাইসরয়, লর্ড কার্জন, যিনি হিন্দু ও মুসলমানের ভিত্তিতে বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করেন, তাঁর "পারস্য ও পারস্যের প্রশ্ন" পুস্তকে জন এলটনের কার্যকলাপ বর্ণনা করতে গিয়ে সন্তোষের সাথে উল্লেখ করেছেন যে এলটন নাদির শাহের নৌ-তৎপরতা পারস্য উপসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগরে ঘুরিয়ে দেন, রুশ-পারস্য সম্পর্ক খারাপ করে তুলে পারস্য সিল্ক রপ্তানীর উপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে

সহজতর করেন এবং এইভাবে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ অবস্থান শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৭৪৭ সালে গুপ্তঘাতকের হাতে নাদির শাহ নিহত হওয়ার পর পারস্যের ক্ষমতারোহন নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত করিম খান বিজয়ী হন এবং ১৭৫৮ সালে তিনি ক্ষমতায় বসেন। জান্দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা করিম খান পারস্যের রাজধানী সিরাজে স্থানান্তর করেন।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টরা করিম খানের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর বিশেষ নজর রাখে। তারা বিশেষভাবে চিন্তিত ছিল এই নিয়ে যে করিম শাহ পারস্য উপসাগরের পূর্ব উপকূলে, বিশেষ করে বুশায়ের-এ, পারস্য প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। ব্রিটিশরা বুশায়ের-এ সদর দপ্তর স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা করে আসছিল।

পারস্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে কোম্পানির এজেন্টরা স্থানীয় আরব শেখ সাদুন-এর সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। ঐ চুক্তিতে আরব শেখকে বুশায়ের-এ বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করা হয়। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৭৬৩ সালের ১২ই এপ্রিল। এই চুক্তির ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের পক্ষে বুশায়ের-এ অবস্থান শক্তিশালী করা ও বাণিজ্যিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে ওঠার পাশাপাশি দক্ষিণ পশ্চিম পারস্যের সর্ববৃহৎ আরব উপজাতি, মাশারিশ উপজাতির প্রধান শেখ নাসর-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলাও সম্ভব হয়। শেখ নাসর ছিলেন শেখ সাদুনের চাচা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টরা মাশারিশ উপজাতির সুন্নী আরব ও করিম খানের প্রজা পারস্যের সিয়াদের মধ্যে বিরোধ জাগিয়ে তোলে এবং তারপর উভয়ের বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এইভাবে তারা করিম খানের কাছ থেকে উপসাগরীয় উপকূল ও খোদ পারস্যে সুযোগ সুবিধা লাভের ফরমান আদায় করে নেয়।

১৭৬৩ সালে ব্রিটিশরা করিম খানকে খুজিস্তানে তাঁর অবস্থান জোরদার করতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা এর বিরুদ্ধেই কাজ করে। এটা ব্রিটিশদের প্রতিশ্রুতি লংঘন ছাড়া আর কিছুই নয়। লন্ডনের নির্দেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টরা করিম খান এবং বসরায় নিযুক্ত তুরস্কের গভর্নরের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করে তুলতে চেষ্টা করে। তারা কাব উপজাতি ফেডা-

রেশনের প্রভাবশালী প্রধান নেতা শেখ সালমানের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করে। কাব উপজাতি, সপ্তদশ শতাব্দীতে নেজদ থেকে কারুন নদীর উপত্যকা ও শাতিল আরবের পূর্ব তীরে এসে বসতি গড়ে তোলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশরা সালমান কর্তৃক পারস্যকে সার্বভৌম রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ করে দেয়, এবং ফলে তাদের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশরা এই বিরোধে সালমানের বিরুদ্ধে করিম খানকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ১৭৬৯ সালে করিম খান তাঁর সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ খরগ দ্বীপে (ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই দ্বীপটিকে দখল করার চেষ্টা করছিল আগে থেকেই) অবতরণ করে, এবং সালমানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান চালায়। কারুন নদীর ভাটিতে এবং শাতিল আরবের কাছে পারস্যের শক্তিবৃদ্ধি ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায়, কোম্পানির এজেন্টরা বসরায় নিযুক্ত তুরস্কের গভর্নরকে খুজিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে উৎসাহিত করে।

১৭৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে তুরস্কের সেনাবাহিনী ব্রিটিশ নৌযানে করে শাতিল আরব পার হয়ে কারুন নদীর মধ্যভাগের তীরবর্তী অঞ্চলে এসে উপনীত হয়। এই ইঙ্গ-তুর্কী সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় "শিয়া-পারস্যের হাত থেকে সুন্নী মতাবলম্বী কাব উপজাতিকে রক্ষা করার" অজুহাতে। এই পরিস্থিতিতে পড়ে করিম খান শেখ সালমানকে তুলনামূলকভাবে কম বিপজ্জনক শত্রু বলে ধরে নেন এবং "শাতিল আরবের এপাশের ভূখন্ড থেকে" অবিলম্বে সকল ব্রিটিশ ও তুর্কী বাহিনী অপসারণের দাবি করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে খুজিস্তানের দক্ষিণে বসবাসকারী কাব উপজাতি ফেডারেশনের সকল আরব তাঁর প্রজা। এভাবে তুর্কীদের তিনি বাধ্য করেন ঐ ভূখন্ড থেকে সেনাবাহিনী অপসারণ করতে। তবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিরস্ত করা যায়নি। ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ব্রিটিশরা পারস্য তুরস্ক সম্পর্ক খারাপ থেকে খারাপতর করে তোলার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে এবং উভয় পক্ষের উপর ব্রিটিশ মধ্যস্থতা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ব্রিটিশরা সম্পর্কের "অবনতি রোধে" খরগ দ্বীপকে ব্রিটিশদের 'শুভেচ্ছার' উপর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দেয়। করিম খান এই অবমাননাকর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

এর পরও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে, ১৮০৮-১৮৪২ ও ১৮৫৬-১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী খরগ দ্বীপ দখল করে। হাস্যকর ব্যাপার, এই দুই সামরিক অভিযানের সময়েই ব্রিটিশরা এই মর্মে যুক্তি দেখায় যে হিরাট দখলের পারস্যের ষড়যন্ত্র থেকে আফগানিস্তানকে রক্ষা করার জন্যেই তারা খরগ দ্বীপে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা খুজিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে অথবা কাব উপজাতি ফেডারেশনের প্রধানদের সাথে খুজিস্তানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াস থেকে কখনোই বিরত থাকেনি। শেখ সালমান ও করিম খানের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বিরোধ উস্কে দেয়ার ১শত ২০ বছর পর লর্ড কার্জন খোররম শহর সফরে যান। 'পারস্য ও পারস্যের প্রশ্ন' শীর্ষক তাঁর পুস্তকে তিনি ঐ সফরকালে তাঁর সাথে অনুষ্ঠিত কাব উপজাতি ফেডারেশনের শেখ মিসাল-এর আলাপ-আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন। লর্ড কার্জন ইচ্ছে করেই শেখকে তাঁর আরব নামে, মোহমেরার শেখ নামে উল্লেখ করেছেন।

ভারতের জাতীয় মোহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল-পত্র থেকে স্পষ্টতই দেখা যায় যে লর্ড কার্জন ও ব্রিটিশ ভাইস-কনসাল উভয়েই জোর চেষ্টা করেছেন শেখ মিসালকে দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করাতে। ব্রিটিশরা তাঁকে "তেহরানের শিয়া উপনিবেশবাদীদের" বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে মিসাল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর বৃটিশরা আরো জঘন্য পদক্ষেপ নেয়। ১৮৯৭ সালে শেখ মিসালকে হত্যা করা হয়। মিসালের ভাই খাসাল কাব উপজাতি ফেডারেশনের প্রধান শেখ হন। শেখ খাসাল ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। ইঙ্গ-ভারতীয় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ, স্বাভাবিকভাবেই, কালবিলম্ব না করে শেখ খাসালকে সামরিক ও রাজনৈতিক উভয়বিধ সমর্থন প্রদানে এগিয়ে যায়। পারস্যের শিয়া কর্মচারীদের উৎপীড়ন থেকে সুন্নী আরবদের রক্ষা করার অজুহাতে শেখ মিসাল কারুন নদীর মধ্যে ও নিম্ন তীরবর্তী অঞ্চলের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা (পুলিশ ব্যবস্থা) নিজের হাতে তুলে নেন।

ময়দান-ই-নাফতুন-এ জ্বালানী তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর, পারস্য উপসাগরীর অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত বৃটিশ রাজনৈতিক

দূত (তাঁর স্থায়ী দপ্তর ছিল বুশায়ের-এ) স্যার পারসি কক্স শেখ খাসালের সাথে ১৯০৯ সালের ৬ই মে ও ১৯শে জুলাই দুইটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। একটি চুক্তিতে ঐ এলাকার ওপর খাসালের 'কর্তৃত্বের' বৃটিশ গ্যারান্টি দেয়া হয় এবং অপরটিতে প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র আবাদান দ্বীপকে ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানির কাছে লীজ দেয়া হয়। ঐ দুই চুক্তি সম্পাদনের পরপরই বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় খুজিস্তানের সুন্নী আরবদের উত্যক্ত করার অভিযোগ তুলে পারস্যের বিরুদ্ধে জোর প্রচারাভিযান শুরু করা হয়। সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে তীব্র বিরোধ জাগিয়ে রেখে তেল-সমৃদ্ধ খুজিস্তানের উপর বৃটিশ কব্জা জোরদার করার জন্য বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা উঠে পড়ে লাগে।

১৯২২ সালে, লর্ড কার্জন বৃটিশ বিদেশ বিষয়ক রাষ্ট্র-সচিব থাকাকালে, বৃটিশ এজেন্টরা শেখ খাসালের প্রতি আহ্বান জানায় দক্ষিণাংশের উপজাতিদের লীগ গঠন করার। এই পদক্ষেপের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খুজিস্তানকে পারস্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা। বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত শহর পেশোয়ারে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা আরবী ভাষায় হাজার হাজার প্রচারপত্র ছাপিয়ে প্রচার করে যে পারস্যের শিয়া শাসকদের হাত থেকে সুন্নী আরবদের রক্ষা করার জন্য শেখ খাসাল দক্ষিণাংশের উপজাতিদের লীগ গঠন করেছেন।

পারস্যের বিশাল তৈল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম ও শাতিল আরব অঞ্চলে প্রভাব জোরদার করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা আরব-পারস্য ও সুন্নী-শিয়া বিরোধ ঘনিয়ে তোলে। তাছাড়া, তারা আরব-পারস্য পারস্পরিক ঘৃণার বীজও বপন করে, যার পরিণতি আজকে ইরাক-ইরান যুদ্ধ।

একই পদ্ধতিতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা পারস্য উপসাগরের পশ্চিম উপকূলেও জাঁকিয়ে বসে। এই এলাকায় বৃটিশ অবস্থান জোরদার করার উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, সৌদি রাষ্ট্রের শাসকরা পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলে। এখনো বৃটিশ ও মার্কিন ইতিহাস-বিদগণ প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন যে এই অঞ্চলের উপর সৌদি প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা আল-আহসা, কাতার ও আবুধাবী-সহ সমগ্র পশ্চিম উপকূলের সকল শাসকগোষ্ঠী ও জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। "বৃটেন ও পারস্য উপসাগর: ১৭৯৫-১৮৮০" পুস্তকের রচয়িতা জে. বি. কেলি এবং "বৃটেন ও পারস্য উপসাগর: ১৮৯৪-

১৯১৪" পুস্তকের রচয়িতা বি. সি. বুশ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা—গোঁড়া সুন্নী ও শিয়া মতাবলম্বীরা ওয়াহাবী সৌদীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিল এবং সেকারণেই তারা সৌদীদের উপকূল অভিমুখী অগ্রযাত্রাকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করে। তবে, ভারতের জাতীয় মোহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল-পত্র থেকে দেখা যায় যে বৃটিশ এজেন্টরা সৌদীদের ও তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশীদের মধ্যকার ধর্মীয় মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ উস্কে দেয়। ১৭৯৯ সালে তুরস্কের সুলতান তৃতীয় সেলিমের সাথে মৈত্রী সম্পাদনের পর বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা সুলতানকে মক্কার শেরিফ গালেব-এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণের পরামর্শ দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, এটা করা হলে গালেব ওয়াহাবীদের বিধর্মী বলে আখ্যা দেবেন এবং তাদেরকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীর অপসারণ করতে বাধ্য করার জন্যে প্রত্যক্ষ সামরিক চাপ প্রয়োগ করবেন।

যাহোক, ১৮০৩ সালে, সৌদীরা গালেবের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে মক্কা ও মদিনাকে নিজেদের আয়ত্ত্বে নিয়ে এসে উপসাগরের পশ্চিম উপকূল দখল করার জন্যে অগ্রসর হয়। বৃটিশ কূটনীতিবিদ ও এজেন্টরা তখন ওয়াহাবীদের প্রতিহত করার নামে সৌদীবিরোধী জোট গড়ে তোলার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। অব্যাহত ভারত লুণ্ঠনের ফলে প্রভূত অর্থবলে শক্তিশালী বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মস্কটের শাসক (মস্কট তখন, বলা যায়, বৃটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়ে গেছে), বাগদাদে নিযুক্ত তুরস্কের গভর্নর ও ফারস্-এ নিযুক্ত পারস্যের গভর্নর জেনারেল—এই তিনজনের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করিয়ে নেয়। এর পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে শিয়া ও সুন্নীদের ঐক্যবদ্ধ করা।

সৌদী শাসক আবদুল আজিজ বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি পারস্য উপসাগর অঞ্চলে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ফারস্-এর গভর্নর জেনারেলের প্রতি আহ্বান জানান বিরোধ-বিবাদ মিটিয়ে ফেলে পারস্য-সৌদী চুক্তি সম্পাদনের। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বর্তমান তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিবেচনা করলে, এই শান্তি স্থাপনের আহ্বানের যৌক্তিকতা এখনো আগের মতোই রয়েছে।

১৮০৩ সালের শরৎকালে, পারস্য-সৌদী আলাপ-আলোচনার এক

গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে আবদুল আজিজ নিহত হন। তাঁর দেহরক্ষীরাই তাঁকে হত্যা করে। নিহত হবার পর তাঁর পাগড়ীতে এক টুকরো কাগজ পাওয়া যায়। কাগজে ফারসী ভাষায় লেখা ছিল :

"ঈশ্বর ও ধর্ম কর্তৃক তোমরা আদিষ্ট হয়েছো আবদুল আজিজকে হত্যা করার জন্যে। সফল হতে পারলে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রভূত পারিতোষিক। আর যদি মৃত্যুবরণ করো, তাহলে তোমাদের জন্যে খোলা থাকবে স্বর্গের দ্বার।"

পাগড়ীতে এই চিরকুট গেঁথে রেখে আসার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা যাতে মনে হয় ফারস্-এর শাসকের নির্দেশেই কোন পারসিক শিয়া ওয়াহাবী শাসক আবদুল আজিজকে হত্যা করেছে। বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা আশা করেছিল এই 'হত্যা-কান্ড' সৌদী-পারস্য সমঝোতা আলোচনা ভেঙে দেবে এবং উপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুণ্ঠনাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ করে দেবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পারসিক কিংবা শিয়া কেউই এই হত্যাকান্ড সংঘঠিত করেনি। বৃটিশ ইস্ট কোম্পানির এজেন্টরা বাগদাদে তুরস্কের গভর্নরের সাহায্য নিয়ে হত্যাকারী নিয়োগ করে। এতদসত্ত্বেও, এখনো পর্যন্ত, ইরানী-সৌদী সম্পর্ক খারাপ করে রাখার জন্যে পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরা ঐ বানোয়াট কাহিনীই প্রচার করে যাচ্ছে।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা শুধু শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিরোধই উস্কে দেয় নি, উপসাগরীয় অঞ্চলে যারাই, ধর্মীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে এগিয়ে গেছে তাদেরই বাধা দিয়েছে। ১৮০৫ সালে আমীর বদর মস্কটের শাসক হন। ওমানের বর্ষীয়ান ইমাম, সাইদের সমর্থনে তিনি উভয় সালতানাৎকে একত্রিত করার এবং ওয়াহাবী সৌদী রাজ্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এর ফলে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভিসন্ধি ভেস্তে যাবার সম্মুখীন হয়। তাই কোম্পানির রেসিডেন্টের নির্দেশে, ১৮০৭ সালে আমীর বদরকে হত্যা করা হয়। তাঁর জায়গায় বসানো হয় বৃটিশদের হাতের পুতুল ও ওয়াহাবীদের জাতশত্রু সাইদ বিন সুলতানকে। পরিণতিতে এই অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী সংঘাত বেধে গেল বৃটিশরা মস্কট ও ওমানে, যে জায়গাকে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা "জলদস্যুদের আখড়া" বা অভিহিত করতো, আশ্রিত রাজ্য গঠনের সুযোগ পেয়ে যায়।

ফলে বাহরাইনে নিজেদের অবস্থান জোরদার করা এবং উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে সৌদীদের প্রভাব দুর্বল করার সুযোগও লাভ করে বৃটিশরা।

একই সময়ে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইউফ্রেতিস, তাইগ্রীস ও শাতিল আরব বিধৌত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের তৎপরতাও অব্যাহত রাখে। ইস্তাম্বুল, বাগদাদ ও তেহরানে বৃটিশ কূটনীতিবিদ এবং লেভান্ট ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোয়েন্দারা সুন্নী-শাসিত অটোমান সাম্রাজ্য ও শিয়া-শাসিত কাজার রাজ্যের মধ্যে আর এক দফা সংঘর্ষ উস্কে দেয়ার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। তবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বাগদাদে নিযুক্ত তুরস্কের প্রভাবশালী গভর্নর হাফিজ আলী অটোমান সাম্রাজ্য ও পারস্যের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই প্রয়াসে তিনি পারস্য-তুরস্ক মৈত্রী সম্পর্কে আগ্রহী ফরাসী কূটনীতির উপর নির্ভর করেন। বৃটিশদের তো হাফিজ আলীকে ক্ষমা করার কথা নয়। ১৮০৭ সালে হাফিজ আলী বাগদাদে নিহত হন। সৌদী আমির আবদুল আজিজ ও মস্কটের সুলতান আমির বদরের ভাগ্যই তাঁকেও বরণ করে নিতে হলো। আবদুল আজিজ চেয়েছিলেন শিয়া পারস্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে, আর আমির বদর চেয়েছিলেন ওয়াহাবী রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে।

এইসব ঘটনা এটাই তুলে ধরে যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শুধু সামরিক সংঘর্ষে উস্কানীই দেয়নি, হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয়ও নিয়েছে। তারা পারস্য ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে, সৌদিয়া ও অন্যান্য আরব শেখ ও আমিরদের মধ্যে, শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে, এবং ওয়াহাবী ও সুন্নীদের মধ্যে জাতিগত ও ধর্মীয় বিরোধ উস্কে দিয়েছে। এসবই করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অবস্থান জোরদার করার জন্যে এবং পারস্য উপসাগরকে "বৃটিশদের নিজস্ব হ্রদে" পরিণত করার উদ্দেশ্যে।

তৃতীয় অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম প্রাচ্যে মার্কিন উপনিবেশবাদ

১. মুসলিম দেশসমূহের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের প্রাথমিক পর্যায়

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব দেখাতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক, কূটনীতিবিদ, গবেষক ও লেখকগণ বলে থাকেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের মতো নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মাত্র, মুসলিম প্রাচ্যে সামরিক-রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে। তাঁরা এই বলে মুসলমানদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই ভূমধ্যসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর আগমন ঘটে এবং ভারত মহাসাগরে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়। তাঁরা আরো দাবি করেন যে মার্কিন নৌ ও সামরিক ঘাঁটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে "সোভিয়েত হুমকি" থেকে মুসলিম জাতিসমূহকে "রক্ষা" করা। তবে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও মোহাফেজখানার দলিলপত্র তাঁদের এসব দাবিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে।

সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছর পরই, মার্কিন বাণিজ্য ও রণতরীর আবির্ভাব ঘটে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায়। তখন থেকেই এই অঞ্চলে শুরু হয় মার্কিন বণিক, কূটনীতিক ও গোয়েন্দা অফিসারদের আনাগোনা। শুরুর দিকে তারা প্রধানত আকৃষ্ট হয় আফিম ব্যবসায়। আফিম ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা হলেও প্রাচ্যের জাতিসমূহ এই ব্যবসাকে গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য করতো। মার্কিন বণিকরা ইজমির ও অটোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকে আফিম ক্রয় করে চালান করতো চীনদেশের

ক্যান্টনে। ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগর পাড়ি দিয়ে এই আফিম নিয়ে যেতে হতো। বৃটিশ প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিযোগিতা করে মার্কিন বণিকরা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বছরে গড়ে ৪ থেকে ৫ টন করে বিষসদৃশ্য এই সামগ্রী ক্যান্টনের বাজারে বিক্রি করতো। লক্ষ লক্ষ চীনাকে নেশাগ্রস্ত করে রাখার পেছনে মার্কিন বণিকদের এই ব্যবসা অবশ্যই এক দারুণ ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছে। আফিম ব্যবসায়ে বণিকদের লাভ হতো শতকরা ৫০০ ভাগেরও বেশি।

এই জঘন্য আফিম ব্যবসার সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করতো মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলিতানিয়ার (লিবিয়া) শাসকদের ভূমিকার উপর। এই দেশগুলোর শেষের তিনটি ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের আওতায়। এসব দেশ তাদের জল-সীমা অতিক্রমের জন্যে আফিম বোঝাই জাহাজের কাছ থেকে বেশ বড়ো অঙ্কের শুল্ক আদায় করতো। অবশ্য তারা বিনিময়ে জাহাজ-গুলোকে খাদ্য ও পানি সরবরাহও করতো। মার্কিন বণিকরা এভাবে তাদের মুনাফার ভাগ কাউকে দিতে রাজী ছিল না। তাই, তারা তাদের সরকারকে আহ্বান জানায় উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর উপর "চাপ প্রয়োগ করে" একটা কিছু অনুকূল ব্যবস্থা করার।

১৭৮৭ সালে মার্কিন সরকার মরক্কোর শাসকের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, বার্ষিক থোক ১০,০০০ ডলারের (বর্তমান মূল্যমানে ১০ লক্ষ ডলার) বিনিময়ে মরক্কো মার্কিন বণিকদের নিরাপত্তা বিধান ও শুল্ক রেয়াতের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৭৯৬ সালে ত্রিপোলির সাথে, এবং তার পরের বছর তিউনি-সিয়ার সাথেও একই ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

মার্কিন বাণিজ্য জাহাজ এসব দেশের বন্দরে যাতায়াতের পথে, মাছ, চাল, চা, মশলাপাতি ইত্যাদির ব্যবসাও করতো। ক্রাউনিন শিল্ড ভ্রাতৃদ্বয় ও জন জ্যাকব এ্যাস্টরের মতো বোস্টনের বণিকরা এই ব্যবসা থেকে বিপুল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে। তারা তাদের অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ করতো ম্যাসাচুসেটস-এর শিল্প-কারখানায়। এর ফলে তারা মার্কিন শাসক মহলেও প্রভূত রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হয়ে ওঠে।

আফিম ব্যবসা ও প্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে অসম ব্যবসায়িক

বিনিময়ের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার অর্জনকারী বণিক ও উদ্যোক্তারা এসেক্স জুন্টো নামে গ্রুপ গঠন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নির্বাচনে এবং সরকারের মন্ত্রী নিয়োগে এই গ্রুপের প্রভাব একসময় নিয়ামক হয়ে ওঠে। এসেক্স গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য বি. ক্রাউনিন শিল্ড নৌ-বিষয়ক মন্ত্রী হন। সিনেটর ও মন্ত্রীদের বিপুল পরিমাণ উৎকোচ দিয়ে জুন্টো প্রেসিডেন্টের পলিসিকে প্রভাবিত করতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশসমূহের শাসকগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তির সংশোধন দাবি করেন। এসেক্স জুন্টো মার্কিন সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেন এবং মার্কিন সরকার উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশসমূহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আগ্রাসনের আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৮৮০ সালে মার্কিন রণতরীর একটা বহর এসে উপস্থিত হয় ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশে। তখন যেহেতু কোনো "সোভিয়েত হুমকি" ছিল না, তাই মার্কিন রণতরী থেকে দাবি করা হয় যে তারা ভূমধ্যসাগরে এসেছে জলদস্যুদের দমন করতে। এর আগেও যদিও, ১৮০১-১৮০৫ সালে মার্কিন এ্যাডমিরাল ও কূটনীতিকরা ত্রিপোলিতানিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। মার্কিন রণতরীর বহর ত্রিপোলিতানিয়ার রাজধানী ত্রিপোলী অবরোধ করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেফারসনের অনুমোদনক্রমে এবং যুদ্ধমন্ত্রী, যিনি ছিলেন এসেক্স জুন্টো গ্রুপের মুখপাত্র, টিমোথি পিকারিং-এর নির্দেশ অনুযায়ী তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলীতে নিযুক্ত মার্কিন কনসাল, যথাক্রমে উইলিয়াম এটন ও জেমস এল. ক্যাথকার্ট ত্রিপোলিতানিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে। একই সাথে তারা দেশটিতে হস্তক্ষেপ করার প্রস্তুতিও নিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে তারা মিসরে নির্বাসিত হামেদ কারমানালির (ত্রিপোলিতানিয়ার শাসকের ভাই) সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলে। এটন ও কারমানালি আনুষ্ঠানিকভাবে এক চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তিতে তাকে ত্রিপোলিতানিয়ার শাসক বানানোর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামরিক ও আর্থিক সমর্থনের পুরো আশ্বাস দেয়া হয়। কারমানালি আমেরিকানদের প্রতিশ্রুতি দেন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের এবং মার্কিনদের প্রতিযোগী ইউরোপীয় বণিকদের উপর আরোপিত শুল্কের হার বৃদ্ধি করার। তিনি তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল উইলিয়াম

এটনকে তাঁর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ করারও প্রতিশ্রুতি দেন।

১৮০৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা এক চিঠিতে মার্কিন নৌ-বিষয়ক মন্ত্রীকে এটন জানান যে তিনি প্রথমে ত্রিপোলী-তানিয়ার পূর্বাংশ দখল করতে এবং তারপর সেখান থেকে মার্কিন অর্থবলে মিশরে গড়ে তোলা হামেদ কারমানালির সেনাবাহিনীর সাথে মিলিতভাবে ত্রিপোলীর উপর আঘাত হানতে চান। তিনি তাঁর কাছ থেকে তাঁর অভিযানে মার্কিন গোলন্দাজ সমর্থন আশা করেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরও করা হয়েছিল। ইটন ও হামেদ কারমানালির দস্যুদল আর মার্কিন মেরিন সেনা-মার্কিন নৌবাহিনীর গোলন্দাজ সমর্থনে দেরনা শহর দখল করে। দেরনার প্রাকারশীর্ষে মার্কিন পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এভাবেই প্রায় ১৮০ বছর আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিপোলি-তানিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসন পরিচালনা করে। মার্কিন শাসক মহল অবশ্য এখনো তাদের এধরনের অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এইতো সেদিনও লিবিয়ার জলসীমায় বিশাল মার্কিন টাস্ক ফোর্স পাঠাতে দেখা গেছে।

দেরনা দখলের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর অবশ্য ত্রিপোলি আক্রমণ করতে হয়নি। ত্রিপোলিতানিয়ার শাসনকর্তা ইউসুফ কারমানালি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উত্তর আফ্রিকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল লীয়ারের সাথে সন্ধি স্থাপন করে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে যেসব শর্ত সন্নিবেশিত হয় তা ছিল দারুণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল।

আরব প্রাচ্যের বিরুদ্ধে এটাই হলো মার্কিন উপনিবেশবাদীদের প্রথম আগ্রাসনমূলক যুদ্ধ। আর এই চুক্তিটিই হলো মুসলিম ত্রিপোলি-তানিয়ার উপর চাপিয়ে দেয়া প্রথম অসম চুক্তি। ত্রিপোলিতানিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন লুণ্ঠনাত্মক আক্রমণের কাহিনী মার্কিন মেরিনসেনাদের যুদ্ধ-সঙ্গীতেও "প্রতিফলিত" হয়েছে। বর্তমানেও এই বিষয়টা আবার সামনে চলে এসেছে যখন হোয়াইট হাউজ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতিসমূহকে দখল করার তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছে মার্কিন মেরিন কোরকে।

ত্রিপোলিতানিয়ায় হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে, কিংবা যথোপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হয়েও চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেকে ত্রিপোলি-

ত্রিপোলিতানিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে তোলার অভিযোগে কিন্তু এটনের কোনো বিচার হয়নি। বরং উল্টো, এসেক্স জুন্টো তাঁকে "আফ্রিকা বিজয়ী" হিসেবে সম্মানিত করে। ম্যাসাচুসেটস স্টেট কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই "কৃতিত্বের" জন্যে ১০,০০০ একর ভূ-সম্পত্তি উপহার দেয়।

এটন আর ক্যাথকার্ট যখন ত্রিপোলিতানিয়ার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা আঁটছিল, তখন মার্কিন নৌ-কমোডোরগণ মরক্কোর সর্ববৃহৎ পোতাশ্রয় তানজিয়ার-এ এসে নোঙর ফেলে। ফলে মরক্কোর আটলান্টিক ও ভূ-মধ্যসাগরীয় উপকূল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। শান্তিকালীন অবস্থায় এ ধরনের অভিযান খুব বেশি একটা সংঘঠিত হতে দেখা যায় না। ১৮০৪ সালের অক্টোবরে মার্কিন কমোডোরগণ তানজিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে একটা সংক্ষিপ্ত বাণী পাঠান ঃ "আপনারা যুদ্ধ না শান্তি চান ?" মার্কিন আগ্রাসনের আশংকায় সন্ত্রস্ত মরক্কোবাসীদের এভাবেই বাধ্য করা হলো একটি চুক্তি সম্পাদনে। চুক্তিতে ১৭৮৬ সালে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদও বাড়িয়ে নেয়া হয়। এই চুক্তির শর্তাবলী ছিল মরক্কো-বাসীদের স্বার্থের আরো প্রতিকূল।

ত্রিপোলিতানিয়া ও মরক্কোয় সহজ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মার্কিনরা তিউনিসিয়ার উপর চাপ বাড়ানো শুরু হরে। ১৮০৪-১৮০৫ সালে তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন দূত বে'-এর (শাসনকর্তার) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বে'-এর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শুরু করেন যাতে বে' তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৮০৫ সালে বে' তাঁকে মরক্কো থেকে বহিষ্কার করেন। আর আমেরিকানরাও এটাই মনে মনে চেয়ে আস-ছিল। ১৮০৫ সালের আগস্ট মাসের ১ তারিখে জন রজার্স-এর নেতৃত্বাধীন মার্কিন নৌবহর কোনো রকম সতর্কবাণী ছাড়াই তিউনিস-এর উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। তারপর রজার্স তিউনিসিয়ার বে'-এর কাছে একটা চুক্তির খসড়া পাঠিয়ে দেন। ঐ খসড়ায় মার্কিন স্কিপার ও কমোডোরদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দাবি করা হয়। বে'কে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় যে অবিলম্বে ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর-দান না করলে তাঁর রাজধানীকে গোলার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। এভাবেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল মার্কিন-তিউনিসিয়া অসম চুক্তি।

১৮১২-১৮১৪ সালের দ্বিতীয় ইঙ্গ মার্কিন যুদ্ধের ফলে এসেক্স জুন্টো বাধ্য হয় উত্তর আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ আলজিরিয়া আক্রমণ

করার পরিকল্পনা কিছুটা পিছিয়ে দিতে। তবে, ১৮১৫ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পূর্ব-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত দেয়। কমোডোর স্টিফেন ডেকাটুর ও কমোডোর উইলিয়াম বেইনস-ব্রিজের নেতৃত্বে, জলদস্যু দমনের নামে, দুই স্কোয়াড্রন যুদ্ধজাহাজ পাঠানো হয় আলজিরিয়ার উপকূলে। আলজিরিয়াবাসীদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে তারা তাদের জাহাজে বৃটিশ পতাকা উড়িয়ে পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করে।

আলজিরীয় নৌবহরকে ধ্বংস করে মার্কিন স্কোয়াড্রন আলজিয়ার্স শহরের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। তারপর তারা আলজিয়ার্সের গভর্নর ডে ওমরের কাছে এক বশ্যতামূলক চুক্তি সম্পাদনের চরমপত্র পাঠায়। চুক্তিতে মার্কিন বণিকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং আলজিরিয়ার উপর ভূখন্ডস্থ অধিকার প্রদানের শর্ত আরোপিত হয়। ডে ওমর নীতিগতভাবে প্রস্তাবিত চুক্তির শর্তাবলী মেনে নেন। কিন্তু তার ফলে স্থানীয় সামন্তপ্রভু ও বণিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাই তিনি ঐ চুক্তি, ১৮১৫-১৮১৬ সালের চুক্তি, অনুমোদনে টালবাহানা শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূর-পাল্লার কামানসজ্জিত আরো যুদ্ধজাহাজ আলজিরিয়ার জলসীমায় প্রেরণ করলে ডে ওমর আমেরিকানদের এই মর্মে লিখে দিতে বলেন যে তিনি "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দুকের নলের মুখে" বাধ্য হয়েছেন চুক্তি সম্পাদন করতে। চুক্তি সম্পাদন ছাড়া তাঁর আর কোনো বিকল্প ছিল না এই মর্মে লিখিত প্রামাণিক দলিল হস্তান্তর ডিসেম্বর মার্কিন-আলজিরীয় বশ্যতামূলক চুক্তি অনুমোদন করেন।

ডে ওমর ও তাঁর পারিষদদের সাথে আলাপ আলোচনার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওদিকে তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলিতানিয়ার বিভিন্ন বন্দরের উপর নতুন করে হামলা শুরু করে। ১৮০৪ ও ১৮০৫ সালে এই দু'টি দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও দস্যু-সুলভ মার্কিনরা তাদের কাছ থেকে আরো শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ দাবি করে।

উত্তর আফ্রিকার বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের এ হলো এক জঘন্য কাহিনী। আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয়দের পা ফেলার শত শত বছর আগে থেকেই এই অঞ্চলের দেশগুলো বিশ্ব সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, কারাওউইনে (মরক্কো)

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ৮৫৯ সালে। তিউনিসিয়ায় প্রখ্যাত কাইরোউয়ান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। আত তারিন ও বু ইনান মাদ্রাসায় ইবনে রুসতা, ইবনে বতুতা ও ইবনে খালদুনের মতো বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম মণিষীগণ তাঁদের গবেষণাকার্জ চালান। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁদের রচনাবলী সারা প্রাচ্যে বিপুল খ্যাতি ও সমাদর লাভ করে।

মার্কিন কমোডোর ও দূতদের উত্তর আফ্রিকা অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এসেক্স জুন্টো ওয়াশিংটনের উপর চাপ প্রয়োগ করে ১৮২০ সালে স্থায়ী ভূমধ্যসাগরীয় স্কোয়াড্রন গঠন করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেপোলিয়নের আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়া স্পেনকেও সাথে পায়। মার্কিন সরকার স্পেনের কাছ থেকে মাহোন বন্দরে (ব্যালেয়ারিক দ্বীপে) মার্কিন রণতরীর স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে।

এভাবেই, ১৬০ বছর আগে মার্কিন ৬ষ্ঠ নৌবহরের পূর্বসূরীরা ভূমধ্যসাগরের জলসীমায় অবতীর্ণ হয়।

২. পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে অনুপ্রবেশ

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা চালানোর পাশাপাশি মার্কিন উপনিবেশবাদীরা ভারত মহাসাগর হয়েও আরব প্রাচ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের এক বিশাল জাহাজ কোম্পানির মালিক এটমন্ড রবার্টস ভূমধ্যসাগরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকারী হন। রবার্টস এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে মার্কিন অনুপ্রবেশে কম ভূমিকা পালন করেননি। ১৮২৩ সালে তিনি জাঞ্জিবার দ্বীপ সফর করেন। জাঞ্জিবার তখন ছিল মস্কটের সুলতান সাইদ-বিন-সুলতানের শাসনাধীন এবং পূর্ব আফ্রিকার ব্যবসাবাণিজ্য, বিশেষ করে, দাস্যব্যবসার এক প্রধান কেন্দ্র। এডমন্ড রবার্টস জাঞ্জিবারে এসে সুলতানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেন। সালতানাতের ইতিহাসে এরকম প্রস্তাব ছিল এই-ই প্রথম। সাইদ-বিন-সুলতান মার্কিন বণিকদের বিপুল সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হন, তবে প্রতিদানে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষ করে কামান ও তার গোলাবারুদ

দাবি করেন।

দেশে ফিরে গেলে, এসেক্স জুস্টো ও নিউ ইংলান্ডের শিল্পপতিরা ভারত মহাসাগর অঞ্চলে রবার্টসের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্প্রসারণের পরিকল্পনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১৮৩২ সালে রবার্টসকে দূরপ্রাচ্য ও মস্কটসহ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেশের মার্কিন সরকারী প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের কাছ থেকে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় মার্কিন সরকার রবার্টসের মিশনের আসল প্রকৃতি গোপন রাখার চেষ্টা করে। সেকারণেই তাঁকে মার্কিন কামানসজ্জিত যুদ্ধজাহাজ পিকক-এর ক্যাপ্টেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে মস্কটের সুলতানের সাথে রবার্টসের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার সব কাগজপত্রে বলা হয় যে সাইদ-বিন-সুলতান পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু, ইতিহাসে দেখা যায়, তার ২০০ বছর আগেই পর্তুগীজরা ঐ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মস্কটের সুলতানের অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল পারস্য উপসাগরীয় এলাকা ও আরব উপদ্বীপের অন্যান্য মুসলিম শাসকদের সাথে তাঁর বিরোধের কারণে। রবার্টস ও তাঁর ঊর্ধতন কর্মকর্তারা ব্যাপারটা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তবুও, তাঁরা এটা গোপন রাখার জন্য এতোই সতর্ক ছিলেন যে এমনকি এতদঞ্চল বিষয়ক মার্কিন নীতির সাম্প্রতিক আলোচনাতেও দাবি করা হয় যে সুলতানকে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়েছিল পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে।

১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে পিকক জাহাজযোগে রবার্টস মস্কটে আসেন। তখনই স্বাক্ষরিত হয় মার্কিন-মস্কট চুক্তি। চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত জাতির সুযোগ-সুবিধা এবং মস্কটের উপর ভূখন্ডগত অধিকার দেয়া হয়। তার উপর, আমেরিকানদের মস্কটে কনসুলেট খোলারও অনুমতি দেয়া হয়।

সাইদ-বিন-সুলতান লাভ করেন মার্কিনদের তৈরি করা জাহাজ ও কামান। এই অস্ত্রশস্ত্র তিনি ব্যবহার করেন আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোম্বাসার নিকটবর্তী তাঁর শাসনাধীন ভূখন্ড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আরব উপদ্বীপে পরিচালিত সামরিক অভিযানে।

মার্কিন মস্কট চুক্তি ১শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে বলবৎ থাকে।

এই মাত্র ১৯৫৮ সালের ২০শে অক্টোবর ঐ চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হয়, তবে তাও আর একটা নতুন চুক্তির মাধ্যমে যে নতুন চুক্তিতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই সালতানাতে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে।

১৯৮৩ সালে ওমানের (মস্কটের বর্তমান নাম) সুলতান কাবুস প্রেসিডেন্ট রেগান, পররাষ্ট্র মন্ত্রী শুলজ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওয়াইনবার্গার-এর সাথে গোপন আলাপ-আলোচনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। উভয় পক্ষ সে সময় ১৮৩৩ সালে সম্পাদিত মার্কিন-মস্কট চুক্তির ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন সামরিক সাহায্য বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন, অপরদিকে সুলতান কাবুস মার্কিন নৌ ও বিমান ঘাঁটির জন্যে মস্কটের ভূখন্ড ব্যবহারের অনুমতি দানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। এই মার্কিন ঘাঁটিগুলো সালতানাতের রাজধানীর খুব কাছেই অবস্থিত। মাসির দ্বীপকে ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম (দিয়েগো গার্সিয়ার পরেই) নৌ ও বিমান ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৮৩ সালে এই অঞ্চলের ইতিহাসের বৃহত্তম সামরিক মহড়া, ব্রু স্টার—৮৩ অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় মার্কিন ৭ম নৌবহর, বিমান স্কোয়াড্রন ও মেরিন কোরের বহু ইউনিট অংশগ্রহণ করে।

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ পিকক-এর মাধ্যমে ১৫০ বছর আগে সূচিত গানবোট কূটনীতির ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই এ অঞ্চলে এসেছে বিমানবাহী জাহাজ আর আওয়াকস-এর যুগ।

মার্কিন শাসক মহল ১৮৩৩ সালে সম্পাদিত মার্কিন-মস্কট চুক্তি এবং একই বছর রবার্টস কর্তৃক সিয়ামের (বর্তমান থাইল্যান্ড) সাথে সম্পাদিত অনুরূপ আর একটি চুক্তির সাহায্যে ভারত মহাসাগরে মার্কিন সম্প্রসারণবাদী নীতি অগ্রসর করে নেয়।

ওয়াশিংটন ভারত মহাসাগরকে সামরিক আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৮৩৫ সালে, অর্থাৎ ভারত মহাসাগরে তার বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি গঠনের কাজ শুরু করার ১৪০ বছর আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্ট ইন্ডিয়া স্কোয়াড্রন গড়ে তোলে। এই স্কোয়াড্রনের অন্যতম মিশন ছিল সামরিক শক্তি প্রদর্শন করা (বর্তমানে ওয়াশিংটনের কাছে যা একটা দারুণ ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে) এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপকূলীয় অঞ্চলের মুসলিম শাসকদের উপর চাপ

প্রয়োগ করা। আর একটা মিশন ছিল ইন্দোনেশিয়া দ্বীপমালা জয় করা।

পরের কয়েকটা বছর তীব্র অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার কারণে মার্কিন শাসক মহল ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় সম্প্রসারণমূলক অভিযানের প্রতি "যথোপযুক্ত" দৃষ্টি দিতে পারেনি। তবে, ১৮৭০-এর দশকে তাদের এই অভিযান এক নতুন গতিবেগ লাভ করে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল চালু হবার পর মার্কিন সম্প্রসারণবাদীদের বিশেষ নজর পড়ে মিসর ও সুদানের উপর। ১৮৭০ সালের মধ্যেই ৫০ জনেরও বেশি মার্কিন সামরিক অফিসার কায়রোতে স্থায়ী হয়ে বসে। এদের মধ্যে ৫ জন ছিল জেনারেল ও কর্নেল। এদের সবাইকে মিশরীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৮৭০ সালে মার্কিন জেনারেল স্টোনকে কায়রোতে মিশরীয় সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এবং মার্কিন কর্নেল চেইলি লঙ-কে করা হয় সুদানে মোতায়েন মিশরীয় সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ। এতে শঙ্কিত হয়ে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার অনাহূত মার্কিন তৎপরতার প্রতিবাদ জানিয়ে মিশরের খেদিবের কাছে বিশেষ লিপি প্রেরণ করে। যাই হোক, আমেরিকানরা ধীরে ধীরে মিশরীয় সশস্ত্রবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নীতি ঠিকই অব্যাহত রাখে।

১৮৭৬ সালে মার্কিন, বৃটিশ ও ইতালীয় কূটনীতিক ও গুপ্তচরেরা ইরিত্রিয়াকে কেন্দ্র করে মিশর-ইথিওপিয়া যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। মার্কিন অফিসাররা যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করে, এবং স্বাভাবিকভাবেই, মিশরীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে। তবে, তা সত্ত্বেও মিশরের পক্ষে ঐ যুদ্ধে পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয়নি।

উপনিবেশবাদীরা এই যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল অনেকগুলো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। তবে, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম-খ্রীস্টান বিরোধ তীব্রতর করা। ওয়াশিংটন, লন্ডন ও রোম যেমন হিসেব করেছিল, ইথিওপিয়া ও মিশর, দুটি দেশই ঠিকই এই যুদ্ধের ফলে দারুণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করে, এবং ১৮৮২ সালের জুনে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর ব্যাপক গোলাবর্ষণের পর মিশরকে করায়ত্ত করে নেয় বহু বছরের জন্যে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর বোমা বর্ষণে রিয়ার এ্যাডমিরাল জন নিকোলেসন-এর নেতৃত্বাধীন মার্কিন ভূমধ্য-সাগরীয় স্কোয়াড্রনের চারটি যুদ্ধজাহাজও অংশ নেয়—ঘটনাটি অনেকেই

জানেন না। আলেকজান্দ্রিয়া শহরকে গোলার আঘাতে দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও শত শত মিশরীয়কে হত্যা করে বৃটিশ বাহিনীর সাথে মার্কিন মেরিন সেনারাও মিশরের মাটিতে অবতরণ করে। আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়ে কর্নেল চেইলি-লঙ আলেকজান্দ্রিয়ায় ঢুকে পড়েন। তারপর থেকে তিনি আর সুদানে মোতায়েন মিশরীয় সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নন, আলেকজান্দ্রিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন কনসুলার এজেন্ট।

উল্লেখ্য যে একশ বছর আগে মিশর-ইথিওপিয়া যুদ্ধ বাধানোর এবং ইরিত্রিয়াকে ইথিওপিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার হোতা মার্কিন শাসকচক্র এখনো ইরিত্রীয় সমস্যাকে ঘোলাটে করে রাখার অপকৌশল থেকে বিরত হয়নি। তাদের এখনকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ইথিওপিয়া ও মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সম্পর্ক যতোটা সম্ভব খারাপ করে তোলা।

৩. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন

১৭৯০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বের পূর্বাংশে, ইন্দোনেশিয়ায় প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে দারুণভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ও সালেম শহরের স্কিপাররা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসে। তারা উত্তর সুমাত্রায় উৎপাদিত উচ্চমানের লবঙ্গ ব্যবসার উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েমের চেষ্টা করে। এই লবঙ্গ ব্যবসায় তখন বিনিয়োগের উপর মুনাফা হতো শতকরা ৭০০ ভাগেরও বেশি।

উত্তর সুমাত্রার মাটিতে শক্ত করে পা রাখার প্রচেষ্টায় আমেরিকানরা মালাক্কা-সুমাত্রা অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘনিয়ে ওঠা ইঙ্গ-ওলন্দাজ বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে। তাছাড়া, জাভা ও দক্ষিণ সুমাত্রায় গেড়ে বসা ওলন্দাজদের সাথে দ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য আচিন-এর বিরোধকেও কাজে লাগায় তারা। ১৮২০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আচিনে এমনকি মার্কিন উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েও চিন্তাভাবনা করে। তবে, আচিন-এর মুসলিম শাসক মহলের প্রতিরোধের সামনে সে পরিকল্পনাতে কোনো কাজ হয়নি। তা সত্ত্বেও, মার্কিন বণিকরা সুমাত্রার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম উপকূলে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। তারা তুরস্কের আফিম আর আমেরিকার হুইস্কির বিনিময়ে মূল্যবান

লবঙ্গ ক্রয় করতো। মার্কিন নাবিকদের সংস্পর্শে এ অঞ্চলে যৌন-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে এবং মৃতুহার বেড়ে যায়।

এসব কারণে উত্তর-পশ্চিম সুমাত্রার অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সেখানকার জনগণ মার্কিন বণিক ও নাবিকদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার আহ্বান জানায় আচিন-এর শাসক মহলের কাছে। এই পরিস্থিতিতে, সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের 'লবঙ্গ উপকূল' নামক শহরের অধিবাসীদের সাথে অহেতুক সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা করে আমেরিকানরা। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল একটা অজুহাত দাঁড় করানো, যাতে অস্ত্র প্রয়োগ করে উপকূলের অধিবাসীদের ভয় পাইয়ে দিয়ে আচিন রাজ্যের ছত্রছায়া লাভের প্রয়াস থেকে বিরত রাখা যায়। ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তারা একটা অজুহাত পেয়েও যায়। মার্কিন বণিক ও মৈত্রী নামক জাহাজের (লবঙ্গ বোঝাই করার জন্যে জাহাজটি বেশ কিছুদিন ধরে জলসীমায় নোঙর করে রাখা হয়েছিল) নাবিকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও গর্হিত আচরণে অতিষ্ট হয়ে কুয়ালা বাটু গ্রামের লোকেরা জাহাজটি দখল করে নেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই পার্শ্ববর্তী মাকি বন্দর থেকে একাধিক জাহাজ এসে উপস্থিত হয় এবং ইন্দোনেশীয়দের বলপ্রয়োগে বাধ্য করে জাহাজটিকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে।

এরপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিষয়ক মন্ত্রী লেভি উডবেরি ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ যুদ্ধ-জাহাজ পোটোম্যাক-কে সুমাত্রার উপকূলে গিয়ে অস্ত্র ও শক্তিবলে মার্কিন মর্যাদা পুনরুদ্ধারের। ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, অর্থাৎ ঐ ঘটনার ঠিক এক বছর পর, স্থানীয় অধিবাসীদের ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ওলন্দাজ পতাকা উড়িয়ে, পোটোম্যাক কুয়ালা বাটুতে উপনীত হয়। কুয়ালা বাটুতে এসেই এই যুদ্ধজাহাজের নাবিকরা এক প্রচন্ড দমনমূলক অভিযানে নেমে পড়ে। আড়াই ঘন্টার মধ্যে আমেরিকানরা ১৫০ জন মুসলমানকে হত্যা ও ২০০-এর বেশি জনকে আহত করে। নৌ-মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এ সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, প্রায় সম্পূর্ণ কুয়ালা বাটু গ্রামকে ভস্মস্তূপে পরিণত করা হয়। বাজার ও বাড়িঘর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলা হয়।

নিউ ইংল্যান্ডের জাহাজ মালিক, বণিক ও শিল্পপতিরা পোটোম্যাক-এর "কৃতিত্ব"কে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে স্বাগতঃ জানায়। ১৮৩২ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে লেখা এক চিঠিতে নৌবিষয়ক মন্ত্রী

লেভি উডবেরি এই অভিযানের কম্যান্ডিং অফিসারকে প্রেসিডেন্ট জ্যাকসনের অভিনন্দন পৌঁছে দেন। পোটোম্যাকের অভিযানের ফলাফল পাবার আগে লেভি উডবেরি মস্কটের জলসীমায় অবস্থানরত তাঁর আত্মীয় এডমন্ড রবার্টসকেও পিকক জাহাজ নিয়ে কুয়ালা বাটুতে উপনীত হবার এবং প্রয়োজন দেখা দিলে পোটোম্যাককে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। সমসাময়িক মার্কিন ইতিহাসবিদগণ এডমন্ড রবার্টসকে প্রাচ্যে মার্কিন কূটনীতির প্রবর্তক বলে অভিহিত করে থাকেন। ১৯৮৩ সালে, মার্কিন-মস্কট চুক্তি সম্পাদনের ১৫০তম বার্ষিকীতে, ওমানের সুলতান কাবুসের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময়ও মার্কিন সাংবাদিক ও কূটনীতিকদের দেখা গেছে রবার্টসের ভূয়সী প্রশংসা করতে।

১৮৩২ সালের আগস্টে রবার্টস কুয়ালা বাটুতে এসে দেখেন তাঁর পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে—পোটোম্যাক ইতিমধ্যেই সুমাত্রার মুসলমানদের রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন যে শত শত মুসলমানহত্যা স্থানীয় বন্দরের অধিবাসীদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলেছে, এবং সন্দেহ নেই, এর ফল ভালই হবে।

মার্কিন সম্প্রসারণবাদীরা লবঙ্গ ব্যবসার একচেটিয়া মুনাফা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি। কিংবা তারা সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম উপকূল লুণ্ঠনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে তারা কালিমানটান দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনের এবং সুলু দ্বীপপুঞ্জে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করে। তারা চীন-ফিলিপাইন ও চীন-ইন্দোনেশিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

১৮৪২ সালে ছয়টি যুদ্ধজাহাজবিশিষ্ট এক মার্কিন নৌবহরের কমান্ডার চার্লস উইলকিস সুলু দ্বীপপুঞ্জের শাসককে বাধ্য করেন একটি দলিলে স্বাক্ষর দিতে। দলিলের পূর্ণপাঠের অংশ বিশেষ ঃ

"আমি, সুলু রাজ্যের সুলতান, মোহাম্মদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি এবং বাধ্যবাধকতা মেনে নিচ্ছি যে, আমার রাজ্যের অন্তর্গত যেকোন দ্বীপে আগত সকল মার্কিন জাহাজ, তার কমান্ডার ও ক্রুদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিধান করবো।" এই চুক্তি উত্তর কালিমানটান-এ আমেরিকানদের অনুপ্রবেশের আরো সুযোগ করে দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বীপের সর্ববৃহৎ রাজ্য ব্রুনেই-এর শাসক তাঁর অধীন উত্তর কালিমানটান-এর এক বিরাট অংশের সার্বভৌমত্ব

সুলুর সুলতানের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন এই এলাকা পরোক্ষভাবে হলেও আমেরিকানদের প্রভাবে চলে গেল।

সুলুর সুলতানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির সুযোগ নিয়ে মার্কিন ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা, কূটনীতিবিদ ও নৌবাহিনীর অফিসাররা উত্তর কালিমানটান-এ কায়েম হয়ে বসার বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত মার্কিন কনসাল বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ঐ সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের সাথে ব্রুনেই-এর শাসক মহলের সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে; কারণ বৃটিশ অভিযাত্রিক জেমস ব্রুক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বৃটিশ সরকারের সমর্থনে নিজেকে সারাওয়াক-এর (ব্রুনেই সালতানাতের অংশ ছিল তখন) রাজা ঘোষণা করে বসেন। মার্কিন জাহাজমালিক ও বণিকরা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ব্রুনেই-এর সুলতানের কাছে লাবুয়ান দ্বীপে ঘাঁটি স্থাপনের ও কয়লা খনির ইজারা প্রার্থনা করে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিনিময়ে। আমরা জানি, সুলুর সুলতানের সাথে আমেরিকানরা ইতিমধ্যেই এক চুক্তি সম্পাদন করেছে, এবং উত্তর কালিমানটান-এর এক বিরাট অংশের উপর দাবি আছে সুলতানের। আমেরিকানরা বুঝতে পেরেছিল এখানে ঘাঁটি স্থাপন করতে পারলে তা মার্কিন বাষ্পচালিত নৌ-কোম্পানিগুলোর জন্য বিরাট সুযোগ এনে দেবে এবং এই অঞ্চলের ভূখন্ড গ্রাসের সুবিধাও বেড়ে যাবে অনেক।

এই পরিস্থিতিতে বৃটিশরাও অবশ্য পাল্টা ব্যাবস্থা গ্রহণ করে। বৃটিশ চাপে কাবু হয়ে ব্রুনেই-এর সুলতান ১৮৪৭ সালে লাবুয়ান দ্বীপ বৃটিশদের হাতে ছেড়ে দেন। ১৮৪৭ সালে তিনি বৃটিশদের সাথে এক নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তাঁর শাসনাধীন কোনো জায়গা অন্য কোনো বিদেশী শক্তির কাছে হস্তান্তর করবেন না।

যাই হোক, কোনো কিছুই আমেরিকাকে থামাতে পারেনি। সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত কনসাল ডি. ব্যালেসটিয়ার, যিনি যুগপৎভাবে বিশেষ মার্কিন প্রতিনিধি ও দূত হিসেবেও কাজ করেন, ১৮৪৯ সালে প্রেসিডেন্ট জাকারি টেলর স্বাক্ষরিত নির্দেশ পান এই এলাকার খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং ব্রুনেই-এর সুলতান ও উত্তর কালিমানটান-এর ছোটখাটো রাজ্যের শাসকদের সাথে স্বার্থানুকূল চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনে সম্ভাব্য সবকিছু করার। ডি. ব্যালেস-

টিয়ার তাঁর দায়িত্ব যথাযথই পালন করেছিলেন।

১৮৫০ সালের ২৫শে জুন ব্যালেসটিয়ার ব্রুনেই-এর সুলতান ওমর আলীর সাথে মৈত্রী, বাণিজ্য ও নৌ-চলাচল বিষয়ক এক সমঝোতামূলক দলিল স্বাক্ষর করেন। এতে মার্কিন শিল্পপতি, বণিক ও জাহাজমালিকদের ব্রুনেই সালতানাতে বিশেষ অধিকার দেয়া হয়।

১৮৫৫ সালে কে. মোসেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী কনসাল হয়ে ব্রুনেই আসেন। তিনিও একজন চতুর ষড়যন্ত্রকারী, বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজ হিসেবে নাম কেনেন। ব্ল্যাকমেইল করে, উৎকোচ দিয়ে এবং সারওয়াকের ওপর বৃটিশ প্রাধান্যে ক্ষুব্ধ ব্রুনেই-এর শাসক মহলের অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে মোসেস ঐ একই বছরে সুলতানকে রাজী করান দ্বীপের উত্তরাংশের এক বিরাট এলাকা (বর্তমানে মালয়েশিয়ার অন্তর্গত সাবাক প্রদেশ) ব্যবহারের জন্যে আমেরিকানদের সুযোগ দিতে। তারপর তিনি হংকং যান এবং সেখানে গিয়ে বৃহৎ মার্কিন ব্যবসায়ী টোরি ও হ্যারিসের কাছে এই দ্বীপে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বত্বাধিকার বেচে দেন। বছর শেষ হতে না হতেই এই দুই ব্যবসায়ী ও কতিপয় মার্কিন পুঁজিবিনিয়োগকারী "আমেরিকান ট্রেডিং কোম্পানি অব বোর্ণিও" গঠন করে। কোম্পানি এখানকার খনিজ সম্পদ আহরণের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিস্তারিত কর্মসূচী হাতে নেয়।

এটাও উল্লেখ করা উচিত যে কে. মোসেস "আমেরিকান ট্রেডিং কোম্পানি অব বোর্ণিও"-র পরিচালনা বোর্ড-এর সাথে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয়, এই ঔপনিবেশিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মার্কিন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করে দেয়ার বিনিময়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির ভবিষ্যৎ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ পাবেন। কে. মোসেস "আমেরিকান ট্রেডিং কোম্পানি অব বোর্ণিও-র" প্রধান কর্মকর্তা টোরিকে এ্যাম-বোয়না ও মারুদুর রাজা হিসেবে নিয়োগ করার ব্যাপারেও সুলতানকে রাজী করান। নবনিযুক্ত রাজাকে আইন প্রণয়নের, প্রজাদের মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত শাস্তিদানের, মুদ্রা তৈরী ও প্রচলনের, স্থল ও নৌবাহিনী গড়ে তোলার এবং অন্যান্য ক্ষমতা, যা সাধারণত সার্বভৌম শাসকদেরই থাকে, প্রদান করা হয়।

১২০ বছর আগে এভাবেই একদল স্বার্থান্বেষী আমেরিকান একটি মুসলিম দেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে।

আমেরিকানরা এখানে চীনা কুলি নিয়ে আসে গ্রীষ্মমন্ডলীর চাষাবাদের জন্যে। তারা ভূমি জরীপ করে তাদের স্বত্ত্বাধীন ভূখন্ডের সীমানা নির্ধারণ করে নেয়। একই সাথে তারা পালাবান দ্বীপ ও ফিলিপাইনের অধীন অন্যান্য কিছু ভূখন্ডের উপরও নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়।

ফিলিপাইন তখন ছিল স্পেনীয়দের অধীনে। ইতিমধ্যে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরাও "আমেরিকান ট্রেডিং কোম্পানি অব বোর্ণিও"কে বেশ কব্জা করে ফেলেছে। তারা উভয়েই এসব আমেরিকান তৎপরতা রোধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৮৮ সালে বৃটিশরা উত্তর সাবাক, সারওয়াক (এখন মালয়েশিয়ার অন্তর্গত একটা রাজ্য) ও ব্রুনেইকে তাদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করে।

এই পর্যায়ে এসেই কালমানটান-এ মার্কিন ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ থেমে যায়। এই অঞ্চলে আমেরিকানদের সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা ব্রুনেই সালতানাতকে দারুণভাবে দুর্বল করে ফেলে, দ্বীপের মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায়, এবং এভাবে উত্তর কালামানটান-এ বৃটিশ উপনিবেশবাদী শাসন কায়েমের পথ করে দেয়। তারপর উত্তর কালামানটান-এ বৃটিশ উপনিবেশবাদী শাসন চলে একটানা এই ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত।

মার্কিন উপনিবেশবাদী সম্প্রসারণের এই হলো প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস। মরক্কোর আটলান্টিক উপকূল থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত, বস্তুতপক্ষে সারা মুসলিম বিশ্বে তাদের এই পর্যায়ের সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও স্পেনিশ উপনিবেশবাদের ইতিহাস নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা হয়েছে তার তুলনায় সমসাময়িক কালের মার্কিন ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা একরকম হয়নি বললেই চলে। তাছাড়া, মার্কিন শাসকমহলও সবসময় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলমানদের কাছে এসব ঘটনা প্রায় অজানা রাখার। তারা এতদসংক্রান্ত বেশির ভাগ দলিলপত্রই প্রকাশ করেনি। মার্কিন ইতিহাসবিদরা এমনকি যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বারবারী রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা ১৮৩৩ সালে সম্পাদিত মার্কিন-মস্কট চুক্তির প্রসঙ্গে আসেন তখনও তাঁরা অনেক বিষয়ই চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন, আংশিকভাবে

কিছু কিছু তথ্য তুলে ধরেন এবং ঐসব ঘটনাকে পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন কাহিনী হিসেবে উপস্থিত করেন। উপনিবেশবাদের ইতিহাস নিয়ে প্রচুর লেখা হলেও, না পাশ্চাত্যে, না উন্নয়নশীল দেশে, মুসলিম প্রাচ্যের দেশসমূহের প্রশ্নে উনবিংশ শতাব্দীতে অনুসৃত মার্কিন উপনিবেশবাদী নীতির কোনো বিশদ ইতিহাস প্রণীত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথের উপর—ভূমধ্যসাগরীয়, ভারত মহাসাগরীয় ও আংশিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রপথের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত উদ্দেশ্যেই লুণ্ঠনাত্মক নীতি অনুসরণ করে। সে আমলে মার্কিন শাসকমহল জঘন্য আফিম ব্যবসা ও অতি মুনাফাজনক মসলাপাতির ব্যবসায় ভাগ বসানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগে। জাহাজের ক্যাপ্টেন (স্কিপার), বণিক, কূটনীতিবিদ, কমোডোর, অভিযাত্রিক ও গুপ্তচরদের নিয়োগ করে ও সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে মার্কিন পুঁজি আলজিরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, ত্রিপোলিতানিয়া, অটোমান সাম্রাজ্য, মস্কট সালতানাৎ, উত্তর-পশ্চিম সুমাত্রা ও উত্তর কালামানটান-এ ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা কায়েম ও নৌঘাঁটি স্থাপন করে। দেড়শ বছরেরও বেশি আগে হোয়াইট হাউস তার ভূমধ্যসাগরীয় ও ইস্ট ইন্ডিয়া স্কেয়াড্রন গঠন করে। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ দেরনা, তিউনিস, আলজিয়ার্স ও কুয়ালাবাটুর উপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে। এক হাতে বাইবেল আর অন্য হাতে ডলারের থলি নিয়ে মার্কিন উপনিবেশ-বাদীরা তাদের পশ্চিমা প্রতিযোগীদের মধ্যে এবং মুসলিম শাসকদের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ জাগিয়ে তোলে; তারা অস্ত্রসস্ত্র বিক্রি করে এবং অস্ত্রের হুমকি প্রদর্শন করে। এইভাবে তারা অটোমান সাম্রাজ্য, পারস্য উপসাগর, জাঞ্জিবার দ্বীপ ও সুলু দ্বীপমালায় ঘাঁটি গেড়ে বসার চেষ্টা করে।

মার্কিন শাসকমহল কেন যে তার মুসলিম প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রথম পর্যায়ের আগ্রাসনমূলক তৎপরতার ঘটনা-বলী গোপন রাখার চেষ্টা করে সেটা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায়। লক্ষ লক্ষ মুসলমান যদি প্রকৃত সত্যটা জেনে যায় তাহলে তারা সহজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবির অসারতা ধরে ফেলবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই উপনিবেশবাদের বিরোধী এবং সে মুসলমানদের প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ বন্ধু।

চতুর্থ অধ্যায়

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মিশর, সুদান ও আফগানিস্তানে বৃটিশ উপনিবেশবাদ

১. মিশরের বিরুদ্ধে আগ্রাসন

মিশর ও সুদান, দেশ দুটি ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপুলভাবে সম্পদশালী। লোকসংখ্যাও অনেক। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে আর লোহিত সাগরের পাড়ে সুবিধাজনকভাবে অবস্থিত মিশর ও সুদান যেন আফ্রিকা আর এশিয়ার এক ভৌগোলিক সেতু। তাছাড়া, সারা মুসলিম বিশ্বের উপর ছিল মিশরের ঐতিহ্যগত প্রভাব। এসব কারণে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের নজর পড়ে মিশরের উপরে।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর পদানত করে কায়রোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম বৃটিশ প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন তদানীন্তন মিশরের শাসক মহম্মদ আলী। ১৮০৭ সালের ১৭ই মার্চ মহম্মদ আলীর সেনাবাহিনী, নীলনদের অববাহিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের সহায়তায়, রোসেত্তার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের পরাস্ত করে। ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে গ্রেট বৃটেনের শাসকচক্র আরব প্রাচ্যে মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, লেবানন ও আরব উপদ্বীপের একাংশ নিয়ে একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে তোলার মহম্মদ আলীর প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে বাধা দেয়। মিশরের শাসনকর্তার এই পরিকল্পনা তাঁর বিরুদ্ধে বৃটিশ শাসকমহলে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন ১৮৩৯ সালের জুন মাসে লেখেন যে তিনি মহম্মদ আলীকে ঘৃণা করেন এবং তাঁকে এমন একজন অশিক্ষিত বর্বর বলে মনে করেন যিনি ঔদ্ধত্য, ধূর্তামী আর ছল-চাতুরীর মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছেন। পামারস্টোনের মতে সুমহান মিশরীয়

সভ্যতা একটা ফালতু ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের বসন্তকালে মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী-ইসরায়েলী হামলার আগেও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এ্যান্থনী ইডেন মিশরীয় জনগণের প্রতি একইভাবে ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন, তবে পার্থক্য শুধু এই যে এবারের পাত্র হলেন জামাল আবদেল নাসের।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা সুয়েজ খাল খননের কাজ বন্ধ করে দেয়ারও চেষ্টা নেয়। ফরাসী পুঁজিতে এই খাল খনন করা হচ্ছিল বলে স্বভাবতই মিশরে প্যারিসের ব্যাঙ্কারদের শক্তি বাড়ছিল। যাই হোক, তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বৃটিশরা মিশরীয়দের অর্থনৈতিকভাবে শ্বাসরুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র আঁটে। ১৮৫২ সালে "ফ্রহলিঙ উন্ড গশেন ব্যাঙ্ক" মিশরের উপর উচ্চ সুদের হারে ৩০ লক্ষ পাউন্ড ঋণ চাপিয়ে দেয়। পরবর্তী ১২ বছরে বৃটিশ ব্যাঙ্কাররাও একই ধরনের প্রতিকূল শর্তে মিশরের উপর আরো সাত সাতটি ঋণ চাপায়। ফলে, ১৮৭৫ সালের শেষাশেষি নাগাদ মিসরের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটি পাউন্ড (বর্তমান মূল্যমানে ২০০ কোটি পাউন্ড)। মিশর প্রকৃত প্রস্তাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ার পথে বসে।

এর সুযোগ নিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলি মিসরের খেদিভ ইসমাইলকে বাধ্য করেন সুয়েজ খাল কোম্পানিতে তাঁর যে অংশ ছিল তা ৪০ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে বিক্রি করে দিতে। স্বাভাবিকভাবেই, এই বেচাকেনার লেনদেন করতে হয়েছিল তড়িঘড়ি করে, কারণ ডিজরেইলি চাচ্ছিলেন না কথাটা প্যারিসের কানে যাক। সেজন্যে তিনি, পার্লামেন্ট দূরের কথা তাঁর মন্ত্রী পরিষদকেও আগে থেকে কিছুই অবহিত করেন নি। তিনি রথসচাইল্ড ব্যাঙ্কিং গ্রুপের প্রধান নাথান রথসচাইল্ড-এর কাছ থেকে টাকাটা ধার চান। রথসচাইল্ড ব্যাঙ্কিং গ্রুপও বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিল মিশরের অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ার। প্রকৃত প্রস্তাবে নাথান রথসচাইল্ডই নেপথ্যে থেকে মিশরীয়দের বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে কলকাঠি নেড়ে আসছিলেন। তাই, রথসচাইল্ড ডিজরেইলিকে টাকা ধার দেয়ার সুযোগ পেয়ে বরং খুশীই হয়েছিলেন। এই উপকারের বিনিময়ে রথসচাইল্ডকে ব্যারন বানানো হয়, এবং বাইবেল ছুঁয়ে শপথ গ্রহণে বাধা থাকা সত্ত্বেও (রথসচাইল্ড যেহেতু ইহুদী) তাঁকে পার্লামেন্টের সদস্য করে নেয়া হয়।

সুয়েজ খাল কোম্পানির মালিকানার একটা অংশ লাভ করার পর পরই লন্ডনের ধনিকদের মুখপত্র দি টাইমস পত্রিকা বিজয়োল্লাস ব্যক্ত করে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধের অংশ বিশেষে লেখা হয়, "আমরাই এখন (কোম্পানির) সবচেয়ে বড়ো অংশীদার। বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে এখন আমাদের ভূমিকাই মুখ্য। (কোম্পানির) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এখন মূলতঃ আমাদের হাতে। আর যেহেতু আমরা এই ক্ষমতা পেয়েছি, বিশ্বের কাছে আমাদের তাই একটা দায়িত্বও আছে।"

এর ফলে মিশরের সেনাবাহিনী ও মুসলিম ধর্মীয়নেতাদের মধ্যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও প্যান-ইসলামইজম মতাদর্শের প্রবক্তা জামালুদ্দীন আফগানীর মতবাদ বৃটিশবিরোধী মনোভাব জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। জামালুদ্দীন আফগানী ১৮৭১-১৮৭৯ সালে মিশরে কাজ করেন। তরুণ তুর্কীদের মতো পাশ্চাত্যপন্থী উদারনীতিকদের বিপরীতে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ও পাশ্চাত্য আদর্শ অনুকরণের বিরোধিতা করেন।

জামালুদ্দীন আফগানী পশ্চিম ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতেন। তবে, পাশ্চাত্যের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে মিশরের পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং মুসলিম ন্যায়বিচার ও প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ মিশরের জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না বলে তিনি মনে করতেন।

মসজিদে নামাজের জামাত শেষে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের সমাবেশে ভাষণ দিয়ে তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি মিশরে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং জাতীয় সরকার গঠনের জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করছিলেন তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তিনি স্বৈরতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক প্রশাসনেরও তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর "স্বৈরতান্ত্রিক সরকার" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনিই প্রথম মুসলিম দেশসমূহে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন।

জামালুদ্দীন আফগানী তাঁর বিভিন্ন ভাষণে দেশপ্রেমিকতা জাগ্রত করার এবং মেহনতী মানুষের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ-বান জানান। তিনি জনগণকে আহবান জানান পাশ্চাত্যপন্থী সরকারের

আনুকূল্য লাভের আশায় বসে না থেকে অবিলম্বে জেগে উঠতে ও সংগ্রাম করতে। ১৮৭৯ সালে মুসলমানদের এক সমাবেশে তিনি বলেন ঃ

"আপনারা দাস হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং বাস করছেন স্বৈর-শাসনের অধীনে। শত শত বছর ধরে আপনারা কালাতিপাত করছেন বিজেতা আর উৎপীড়কের ঘোয়াল কাঁধে নিয়ে।...কপালের ঘাম ফেলে যে খাদ্য আপনারা উৎপন্ন করেন তা কেড়ে নেয়া হয় আপনা-দের কাছ থেকে।...নিস্পৃহতা ঝেড়ে ফেলে জেগে উঠুন।...অজ্ঞানতা আর আলস্যের কালিমা ঝেড়ে ফেলুন। বাঁচতে হলে স্বাধীন জাতির মতো বাঁচাই ভাল, তা না হলে শহীদের মৃত্যু, সে অনেক শ্রেয়ঃ।"

মিশরে প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার বিকাশের ইতিহাস জামালুদ্দীন আফগানী ও তাঁর অনুসারী মুহাম্মদ আবদু, আব্দুল্লাহ নাদিম ও আদিব ইসহাকের নামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁরাও আল আজহার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে উপ-নিবেশবাদবিরোধী চেতনা জোরদার করার ক্ষেত্রে এবং মিস্‌র আল-ফাতাত (তরুণ মিসরীয়দের সোসাইটি) ও আল-জামিয়া আল-খায়রিয়া আল-ইসলামিয়ার (মুসলিম সেবা সমিতি) মতো বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলায় বিপুল অবদান রাখেন।

শেষোক্ত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তরুণদের জাতীয়তাবাদী পার্টি হিস্‌ব আল-ওয়াতান-এর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। হিস্‌ব আল-ওয়াতানের অন্যতম নেতা ছিলেন কর্নেল আহমদ উরাবি। এসব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। এসব সংগঠনের চাপে মিশরের খেদিভ মুহাম্মদ তৌফিক বাধ্য হন ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক নতুন সরকার গঠন করতে। জামালুদ্দিন আফগানীর (যাঁকে বৃটিশ এজেন্টদের চাপে মিসর থেকে বহিষ্কার করা হয়) মতাদর্শের অনুসারী আহমদ উরাবি নতুন সরকারের যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা মিশরে ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার দেশ-প্রেমমূলক শ্লোগানকে প্রগতিশীল মুসলিক ধর্মনেতারাও সমর্থন করেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা সারা মিশরে ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা লৌহহস্তে দমন করার সিদ্ধান্ত নেয় লন্ডন।

১৮৮২ সালের বসন্তকালে আহমদ উরাবির নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার কর্তৃপক্ষ সেখানকার দুর্গটি সংস্কারের কাজে হাত দেয়। মিশরের শাসক মহম্মদ আলী এই দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরকে রক্ষা করার জন্যে। দুর্গ সংস্কারের কাজকে বৃটিশরা মিশরে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের অজুহাত হিসেবে লুফে নেয়—তারা এরকম একটা অজুহাতই খুঁজছিল বহুদিন ধরে। ১৮৮২ সালের মে মাসে এ্যাডমিরাল স্যার জর্জ সিমুর-এর নেতৃত্বাধীন বৃটিশ ভূমধ্যসাগরীয় স্কোয়াড্রনের একটা নৌবহর আলেকজান্দ্রিয়ার পোতাশ্রয়ে এসে নোঙর ফেলে। এ্যাডমিরাল সিমুর জুলাই মাসের ৬ তারিখে দুর্গ সংস্কারের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করার কড়া দাবি জানিয়ে এক চরম হুঁশিয়ারী প্রদান করেন। মিশরের সরকার জানিয়ে দেয় যে তাদের দেশের প্রবেশ দ্বারে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তাদের আছে। মিশরের সরকার এটাও জানায় যে আলেকজান্দ্রিয়ায় নতুন কোনো প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছেনা, আর পুরনো দুর্গে নতুন কোনো কামানও মোতায়েন করা হবে না। এতদসত্ত্বেও, জুলাইয়ের ১০ তারিখে এ্যাডমিরাল সিমুর আরো কড়া ও আরো উস্কানীমূলক এক চরমপত্র দিয়ে দাবি করেন যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তাঁর উপর ন্যস্ত করতে হবে। ১৮৮২ সালের জুলাই মাসের ১১ তারিখে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। প্রচন্ড গোলার আঘাতে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, ২০০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী, সমৃদ্ধিশালী ও বর্ধিষ্ণু আলেকজান্দ্রিয়া শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে মিশরের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই জঘন্য অপরাধমূলক হামলায় মার্কিন ভূমধ্যসাগরীয় স্কোয়াড্রনের যুদ্ধজাহাজও অংশ নেয়। ঐ আমলে আমেরিকানরা ছিল বৃটিশ আগ্রাসকদের জুনিয়র পার্টনার। একশ' বছর পরে, এখন ভূমিকাটা উভয়ের মধ্যে বদলা-বদলি হয়ে গেছে। লেবানন ও মিশরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে দেখা যায়, এখন উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রধান হুমকিটা আসছে গত শতাব্দীর মার্কিন ভূমধ্যসাগরীয় স্কোয়াড্রনের স্থান দখলকারী মার্কিন ৬ষ্ঠ নৌবহর ও দ্রুত মোতায়েনক্ষম মার্কিন বাহিনীর কাছ থেকে। অবস্থা দেখে মনে হয়, মার্কিনরা যেন মৌরসী পাট্টা ছড়িয়ে বসতেই এই

অঞ্চলে এসেছে।

১৮৮২ সালের জুলাই মাসে ফিল্ড মার্শাল গারনেট ওলসেলির নেতৃত্বাধীন বৃটিশ অভিযানকারী বাহিনী নীলনদের অববাহিকায় অবতরণ করে এবং কাফ্‌র এল দাওয়ার-এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চূর্ণ করে কায়রোর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মিশরীয়রা বৃটিশদের ঐ আক্রমণাভিযান ব্যর্থ করে দেয়। বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা তখন তাদের বহু পুরনো ও বারবার পরীক্ষিত একটি কৌশলের, অর্থাৎ উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হাত করার আশ্রয় গ্রহণ করে। লন্ডনের রথসচাইল্ড ব্যাংক আহমেদ উরাবিকে বার্ষিক চার হাজার পাউন্ড পেনশনের বিনিময়ে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার ও দেশ ছেড়ে চলে যাবার টোপ দেয়। সমরমন্ত্রী হিসেবে উরাবি তখন বৃটিশ আক্রমণাভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্বদানের দায়িত্বে ছিলেন। ওদিকে প্যারিসের রথসচাইল্ডও উরাবিকে একই শর্তে অফার দেয় বার্ষিক ছয় হাজার পাউন্ড পেনশনের।

গ্রেট বৃটেনের শাসকমহলের স্বার্থরক্ষাকারী লন্ডনের রথসচাইল্ড আর ফ্রান্সের শাসকমহলের স্বার্থরক্ষাকারী প্যারিসের রথসচাইল্ডের মধ্যে বিরোধ কখনোই দূর হবার নয় বলে যে প্রচলিত ধারণা আছে তা কিন্তু উপরের ঘটনা থেকে একেবারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কোনো মুসলিম দেশ যখনই সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তখনই উপনিবেশবাদীরা সাথে সাথে তাদের আগেকার বিরোধ ভুলে গিয়ে একজোট হয়ে কাজ করেছে। ১৯০৭ সালে আতাঁত গঠনের সময়ও এটাই ঘটেছিল। ফরাসী উপনিবেশবাদীরা তখন মিশরের "বিনিময়ে" মরক্কো দখলের "অধিকার" লাভ করে।

সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশসমূহের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে কাজ করেছে এরকম বহু উদাহরণ দেয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এরকম একাধিক ঘটনা ঘটেছে। ১৯৫১ সালে ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের নেতৃত্বাধীন ইরানের আইনসঙ্গত সরকার যখন ইঙ্গ-ইরানীয় তেল কোম্পানি জাতীয়করণ করে তখন সাম্রাজ্যবাদীরা হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যায় ইরানের বিরুদ্ধে। আরব দেশসমূহের মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইহুদীবাদী আগ্রাসকদের পাঁচ পাঁচটি যুদ্ধেও মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ 'ঐক্য ফ্রন্ট' গঠন করে ইসরায়েলের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এই ১৯৮৩ সালেও তারা তাদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী মোতায়েন করে লেবাননে, লেবাননের মুসলমানদের সংগ্রামকে

দমন করার উদ্দেশ্যে, কারণ তাদের এই সংগ্রাম চেতনার দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ইহুদীবাদবিরোধী।

যাই হোক, একশ বছর আগের যে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তাতেই আবার ফিরে যাওয়া যাক। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের কাছে যেমনটা আশা করা যায়, মিশরের দেশপ্রেমিক উরাবিও রথসচাইল্ডদের ঐ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন। তিনি আগ্রাসকদের হটিয়ে দেয়ার প্রস্তুতি নেন এবং গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

তবে, খেদিভ মুহাম্মদ তৌফিক-এর নেতৃত্বাধীন মিশরের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকমহল শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে বিদেশী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনগণের সংগ্রাম সামন্তবাদবিরোধী প্রবল আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। ১৮৮২ সালের ২৩শে জুলাই, আগ্রাসকের বিরুদ্ধে অভিযান থামানোর খেদিভের নির্দেশ আহমদ উরাবি প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে পদচ্যুত করা হয় এবং নতুন সরকার গঠিত হয়। তার দুইদিন পর আহমদ উরাবি জনগণকে উদ্দেশ্য করে এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। আবেদনপত্রে তিনি খেদিভ তৌফিককে দেশ ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য লঙ্ঘনকারী একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ২৯শে জুলাই আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উলেমাগণ আহমদ উরাবির সমর্থনে এক ফতওয়াহ জারী করেন।

খেদিভের পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই, মিশরের সামরিক পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। ১৮৮২ সালের ২রা আগস্ট বৃটিশরা সুয়েজে সেনাবাহিনী নামায় এবং ২০শে আগস্ট ইসমাইলিয়া ও বন্দর সৈয়দ দখল করে নেয়। এবং এভাবে তারা সমগ্র সুয়েজ খাল এলাকায় তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

সেই থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশরা সুয়েজ খাল এলাকাকে কব্জা করে রাখে। মিসরের সমগ্র জনগণের দৃঢ় সমর্থনপুষ্ট নাসের সরকারের জোর দাবির মুখে ১৯৫৫ সালে বৃটিশরা বাধ্য হয় সুয়েজ খাল ছেড়ে যেতে। তবে, মাত্র এক বছর পর, ১৯৫৬ সালে, ত্রীপক্ষীয় আগ্রাসনের মাধ্যমে বৃটিশ আক্রমণকারীরা সুয়েজ আবার দখল করে নেয়। কিন্তু মিশরীয় সশস্ত্র বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে, এবং প্রত্যুত্তরে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে এই মর্মে সোভিয়েত হুঁশিয়ারী প্রদানের পর তারা বাধ্য হয় মিশর থেকে তাদের সশস্ত্র

বাহিনী অপসারণ করতে।

১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বরে বৃটিশ আগ্রাসকরা আহমদ উরাবির প্রধান বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভিযান চালায়। মুহম্মদ তৌফিক তখন বিশেষ ডিক্রি জারী করে ফিল্ড মার্শাল ওলসেলির হামলাকারী বাহিনীকে মিশরের সশস্ত্র বাহিনীরই অংশ বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা থেকে মিশরের খেদিভ ও শাসকচক্রের দাসত্ব-বৃত্তির মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখের দিবাগত রাত্রে তেল এল-কেবির-এ সংঘঠিত যুদ্ধে আহমদ উরাবির বাহিনী পরাজয় বরণ করে। ১৮৮২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ বাহিনী কায়রোতে প্রবেশ করে। আহমদ উরাবি ও তাঁর সহযোদ্ধাদের গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়া হয়। তবে, পরবর্তীতে মৃত্যুদন্ডের আদেশ কার্যকর না করে আহমদ উরাবিকে সিংহলে নির্বাসিত করা হয়। এই যুদ্ধের শেষে মিশরের প্রায় ৩০,০০০ দেশপ্রেমিককে গ্রেপ্তার করে হয় কারদন্ড নয়তো দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। মিশরে চালু হয় ঔপনিবেশিক স্বৈরতন্ত্র আর স্বেচ্ছাচারী শাসন। তার উপর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবেও ৯০ লক্ষ পাউন্ড পরিশোধ করতে বাধ্য হয় মিশরের জনগণ। এ থেকে বৃটিশদের যুদ্ধের সকল খরচ তো বটেই, সাথে সাথে সুয়েজ খাল কোম্পানিতে লগ্নিকৃত অর্থও, সুদসহ ধরলেও, উঠে আসে।

বৃটিশ ও তাদের এজেন্টরা মিশরের দেশপ্রেমিক, মুসলিম ধর্মগুরু-দের প্রগতিশীল অংশ ও জামালুদ্দিন আফগানীর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তীব্র দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তেল এল-কেবির-এর যুদ্ধের আগে মুসলিম বাহিনীর বিজয় কামনা করে মুসলিম ধর্মনেতাগণ একাধিক প্রার্থনা-সভার আয়োজন করেন। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত দেশের প্রধানতম মসজিদ এবং হুসেন ও সিত্তা জয়নার দরগা শরীফেও এ ধরনের প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম ধর্মনেতাদের এইসব প্রার্থনা-সভা আয়োজন করার 'অপরাধ' আক্রমণকারী বৃটিশরা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেনি।

১৮৮২ সালে পর থেকে, আনুষ্ঠানিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হলেও, মিশর বস্তুতপক্ষে একটি বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়।

মিশরকে করায়ত্ত করার মাধ্যমে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা সুয়েজ খাল, সিনাই উপদ্বীপ ও লোহিত সাগরের উত্তর-পশ্চিম পাড়ে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। ফলে বৃটিশ ব্যাংকার ও ব্যবসায়িক উদ্যোক্তারাও প্রভূত পরিমাণে মুনফা লোটার সুযোগ পায়। তাছাড়া, বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা মিশরকে তার প্রতিবেশী সুদানের উপর থাবা বিস্তারের ঘাঁটি হিসেবেও ব্যবহার করে।

সুদানের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ এবং ব্লু নীল ও হোয়াইট নীলের উপর, সাধারণভাবে নীলনদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের উদ্দেশ্যে লন্ডনের শাসকচক্র বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। নীলনদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নীলনদ বিধৌত সবগুলো দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ইচ্ছেমতো প্রভাবিত করা যাবে বলেই তারা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তার উপর, সুদানকে করায়ত্ত করতে পারলে লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলেও উপনিবেশবাদীরা তাদের অবস্থান জোরদার করতে পারবে। ফলে কেনিয়া, উগান্ডা ও কঙ্গো উপত্যকা অঞ্চলে আধিপত্য সম্প্রসারণের বিপুল সুযোগও খুলে যাবে। অপরদিকে এটা আবার বৃটিশ শাসকশ্রেণীর মধ্যকার সবচেয়ে আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন অংশের "বৃটিশ আফ্রিকান সাম্রাজ্য" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও সহায়তা করবে। এই পরিকল্পনা, কার্ল মার্কস তাঁর কন্যা এলিনরকে লেখা এক চিঠিতে যেমন বলেছেন, নীলনদের বদ্বীপ অঞ্চল থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আফ্রিকান ভূখন্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। তাই বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা পূর্ব আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ স্থাপনের পথে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের পরাভূত করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। এদিকে ফরাসীরা ইতিমধ্যেই আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ স্থাপনে অনেকটা এগিয়ে যায়। তারা আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলে ইতিমধ্যেই জেঁকে বসে এবং আফ্রিকার ভিতর দিয়ে এডেন উপসাগরের কূলে অবস্থিত তাদের নতুন উপনিবেশ জিবুতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

১৮৭০-এর দশকের শুরুর দিকে সুদানের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত ছিল একদল অর্থলিপ্সু ও উদ্ধত বহিরাগতদের হাতে। এরা সুদান শাসন করতো মিশরের খেদিভের নামে। অর্থাৎ খেদিভের তথাকথিত

প্রতিনিধি হিসেবে। সুদানের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করতে গিয়ে তারা আরব উপজাতি প্রধান, আরব বণিক, বিশেষ করে দাস ব্যবসায়ী, এবং সাধারণত বলকান, এশিয়া মাইনর ও লেভান্ত থেকে আগত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের (যাদের অধিকাংশই সম্প্রতি ধর্মান্তরিত মুসলমান) সমর্থনের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের সবাইকে "তুর্কী" বলে অভিহিত করতো এবং এদের বিরুদ্ধে তাদের মনে ছিল তীব্র ঘৃণা। সুদানের উপর থাবা বিস্তার করতে গিয়ে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা সুদানের এই পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিতে সচেষ্ট হয়।

১৮৬৯ সালে বৃটিশ অভিযাত্রিক স্যামুয়েল হোয়াইট বেকার ইকুয়েটোরিয়ার (সুদান) গভর্ণর নিযুক্ত হন। লন্ডনের নির্দেশে তিনি উগান্ডায় বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে—আলবার্ট হ্রদ ও উনিওরো অভিমুখে—একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৮৭৩ সালে বৃটিশ জেনারেল প্যাট্রিক গর্ডন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। প্যাট্রিক গর্ডন আফিম যুদ্ধ ও তাইপিঙ বিদ্রোহের সময় হাজার হাজার চৈনিককে হত্যা করে ইতিমধ্যেই একজন "স্বনামধন্য" ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। লন্ডনের ব্যাংকারদের উপর মিশরের শাসকের নির্ভরশীলতা দিন দিন বাড়তে থাকার সুযোগ নিয়ে বৃটিশরা তাঁকে বাধ্য করে ১৮৭৭ সালে প্যাট্রিক গর্ডনকে সমগ্র সুদানের 'গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করতে। গর্ডন গভর্নর জেনারেল হয়েই সুদানের বিভিন্ন প্রদেশে তার দোসর, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের গভর্নর নিয়োগ করে। জার্মানির শনিৎসারকে (এমিন পাশা) ইকুয়েটোরিয়া প্রদেশের, ইটালির জেসিকে কোরদোফান প্রদেশের, অস্ট্রিয়ার স্লাতিনকে দারফুর প্রদেশের এবং ইংল্যান্ডের ল্যাপটনকে বাহ্‌র এল চাজেল প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করে। অর্থ ও পণ্য উভয় আকারে ঐ কর জোরপূর্বক আদায় করা হতো। ১৮৫৭ সালে জারী করা খেদিভের এক ফরমানবলে দাসব্যবসা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারা গোপনে দাস ব্যবসাকে উৎসাহিত করা শুরু করে। খেদিভের নামের আড়ালে গর্ডন ও তাঁর দোসররা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে, নীল অববাহিকায় বসবাসকারী উপজাতি ও আরবদের মধ্যে, বেদুইন ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের মধ্যে, মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে বর্ণগত, জাতিগত ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ উস্কে দেয়।

উল্লেখ্য যে, মুষ্টিমেয় একদল বহিরাগত ভাগ্যান্বেষী, বৃটিশ ব্যাংকার

ও কনসালের উপর নির্ভরশীল পুতুলসম খেদিভের "কর্তৃত্ব"কে কাজে লাগিয়ে কিভাবে সুদানের মতো একটা বিশাল দেশকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এটা ভেবে পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের প্রায়ই অবাক হতে দেখা যায়। তবে বৃটিশ সরকারের মোহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিলপত্র থেকে দেখা যায়, জেনারেল গর্ডনের নেতৃত্বাধীন বহিরাগত ভাগ্যান্বেষী ঐ দলটি প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিবেশ বিষয়ক বৃটিশ সচিব ও কায়রোয় নিযুক্ত বৃটিশ কনসাল জেনারেলের নির্দেশই পালন করে গেছে অক্ষরে অক্ষরে। এদের পেছনে বৃটিশ কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য সব ধরনের সমর্থন ছিল।

১৮৭৯ সালে সুদানের পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে এবং সে খবর ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। মুসলিম বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। প্রায় একই সময়ে আফগানিস্তানে বৃটিশ আক্রমণাভিযানের (১৮৭৮-১৮৮০ সালের দ্বিতীয় আফগান-ব্রিটিশ যুদ্ধ) বিরুদ্ধেও জনমত তীব্র আকার ধারণ করে। বৃটিশ-বিরোধী জনমতকে প্রশমিত কররে উদ্দেশ্যে তাই লন্ডন সিদ্ধান্ত নেয় গর্ডনকে সরিয়ে তার জায়গায় একজন মুসলমান গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করার। তবে পরিস্থিতি ক্রমেই আরো খারাপ হতে থাকে, কারণ নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল রউফ পাশা এবং পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত আবদ আল-কাদির, উভয়েই বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।

১৮৮১ সালে সারা সুদানে ইঙ্গ-মিসরীয় উপনিবেশবাদী ও তাদের দুর্নীতিবাজ স্থানীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। এই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দান করেন একজন দরবেশ, মোহাম্মদ আহমেদ। তিনি ইমাম মেহদী হিসেবে জনগণের সামনে আবির্ভূত হন। খার্তুমের দক্ষিণে, নীল নদের মোহনায় অবস্থিত আবা দ্বীপে তিনি দীর্ঘ দশ বছর অবস্থান করেন এবং সেখানে তিনি মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী একজন দরবেশ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। হাজার হাজার লোক তাঁর বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, কারণ ঐ বাণীতে ছিল শুদ্ধ ইসলাম ধর্ম অনুসরণের আর বিশৃংখলা ও "বিধর্মীদের" কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান। তিনি "তুর্কী"দের বিধর্মী হিসেবে আখ্যায়িত করেন, কারণ তারা শুধু নামেই মুসলমান। ১৮৯১ সালের আগস্টে মোহাম্মদ আহমেদ জনগণকে জেহাদে অংশগ্রহণের ডাক দেন। ঐ জেহাদের লক্ষ্য ছিল শুধু সুদানকে নয়, মিশর, আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশকেও বিধর্মীদের শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত করা। মেহ-

দীর (দরবেশ মহম্মদ আহমেদ) আহ্বানের এই দিকটির সাথে জামালুদ্দিন আফগানীর প্যান-ইসলামিক পরিকল্পনার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সমগ্র সুদানের হাজার হাজার দারিদ্র্যপীড়িত, ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব মানুষ মহম্মদ আহমেদ-এর পাশে এসে সমবেত হয়। স্লাতিন পাশা, যিনি, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুদানের একটি প্রদেশের গভর্নর ছিলেন, তাঁর রচিত "সুদানে আগুন আর অস্ত্রের খেলা" পুস্তকে গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে লিখে গেছেন ঃ

"মেহদী এসে গেছে, এই ঘটনাটি প্রত্যেক সুদানবাসীকে আত্মগর্বে উদ্দীপ্ত করে তোলে। (মেহদী আগমনের) অর্থ হলো এর পর থেকে আর বিদেশীরা নয়, দেশের সন্তানরাই দেশ চালাবে।" ১৮৮১-১৮৮২ সালে দারফুর, কোরদোফান ও বহর এল চাজেল-এর উপজাতিরা মেহদীর "রাজধানী" গালেব দেদির-এ এসে সমবেত হয়।

সুলেইমান-এর নেতৃত্বাধীন বাক্কারা আরব উপজাতি জোট এর আগে একটা গণ-অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ১৮৮০ সালের মে মাসে ইঙ্গ-মিশরীয় শাসকচক্র ঐ অভ্যুত্থান দমন করে। অভ্যুত্থান নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার পরও এই জোটের যারা তখনো টিকে ছিল তারা মেহদীর সাথে যোগ দেয়। এরাই এখন মেহদীর পদাতিক বাহিনীর প্রধান শক্তি। মেহদী তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন মিশরীয়দের নিয়ে। ১৮৮০-এর দশকের মধ্যভাগে মেহদীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮,০০০। উল্লেখ্য যে, শহরের শিক্ষিত লোকজনও ধীরে ধীরে মেহদীর সাথে এসে যোগ দিতে থাকে। এমনকি খার্তুম, ওমদুরমান ও সুদানের অন্যান্য শহরের বহু লেবানীজ খ্রীস্টানও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মেহদীর অনুসারী হয়।

পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরা বোঝানোর চেষ্টা করে থাকে যে মেহদীর আন্দোলনটা ছিল স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বেদুঈনদের বিদ্রোহ। কিন্তু প্রকৃতি ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায়, ঐ গণ-অভ্যুত্থানে জাতীয়, প্যান-ইসলামিক ও উপনিবেশবাদবিরোধী চেতনা সমন্বিত হয়েছিল। ১৮৮৩ সালের বসন্তকালে সুদানের দক্ষিণে নীলনদের অববাহিকায় বসবাসকারী একাধিক উপজাতি মেহদী-পন্থীদের সাথে যোগদান করে। মেহদীর পতাকাতলেই নাইলট (নীল-নদের অববাহিকার আদি বাসিন্দা) ও আরবরা—প্রাক্তন দাস ও দাসমালিক-দের উত্তরপুরুষরা—এই-ই প্রথম একসঙ্গে সমবেত হয়। ১৮৫০-এর

দশকের দিকে মিশর দক্ষিণ সুদান থেকে প্রতিবছর দেড় থেকে দুই লক্ষ দাস নিয়ে যেত। এই ঘৃণ্য দাসব্যবসায় তারা তাদের দোসর হিসেবে পেয়েছিল পশ্চিম সুদানের বেদুঈন আরব উপজাতি প্রধানদের।

১৮৮৩ সালের অক্টোবরে ইঙ্গ-মিশরীয় বাহিনী মেহদীর প্রধান ঘাঁটি কোরদোফান প্রদেশে অভিযান শুরু করে। তাদের বাহিনীতে ছিল ১০ হাজার সৈন্য এবং ঐ বাহিনীর সমরাধিনায়ক ছিলেন একজন বৃটিশ, কর্ণেল হিক্‌স। মোহাম্মদ আহমেদ সারা দেশের সর্বত্র তাঁর সমর্থক থাকায়, হিক্‌স-এর বাহিনীর অগ্রাভিযান সম্পর্কে সব রকম খবরাখবর আগে থেকেই পেয়ে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে, হিক্‌স মেহদীর বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছিলেন না। যাই হোক, ১৮৮৩ সালের ৫ই নভেম্বর আল ওবায়েদ-এ দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মেহদীর বাহিনীর হাতে ইঙ্গ-মিশরীয় বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে জোরপূর্বক বাধ্য করা হাজার হাজার মিশরীয় এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। এ থেকে দেখা যায়, বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা মিশরীয়দের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সুদান পুনর্দখল করতে চেয়েছিল।

১৮৮৪ সালের প্রথম দিকে এসে শুধু নীলনদের উপত্যকা, দক্ষিণ সুদানের একটি অংশ, খার্তুম আর ওমদুরমান এই কয়টি এলাকাই ইঙ্গ-মিশরীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বৃটিশরা মিশরের পুতুল সরকারকে দিয়ে সুদান থেকে "সাময়িকভাবে" মিশরীয় সৈন্য-বাহিনী প্রত্যাহার করায় এবং জেনারেল গর্ডনকে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করিয়ে নেয়। জেনারেল গর্ডনকে আক্রমণাভিযান পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়।

১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে খার্তুমে এসে গর্ডন লন্ডনের নির্দেশ বাস্তবায়নের কাজে হাত দেন। তিনি মিশরের তথাকথিত কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে এসে সুদানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। "স্বাধীনতার" এই ঘোষণায় তিনি "তুর্কী" প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেন। তারপর তিনি সুদানকে দুইভাগে ভাগ করার পদক্ষেপ নেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের উত্তরাংশকে দারফুর-কোরদোফান সালতানাতে এবং নাইলো-টিক দক্ষিণ ভাগকে বিশেষ বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় পরিণত করা।

এর পর থেকে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা সব সময় উত্তরকে দক্ষিণের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধ সুদান রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত

করে এসেছে, সুদান ও মিশরের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রেখেছে এবং এইভাবে সুদানের উপর তাদের শাসন কায়েম করেছে।

সুদানের উত্তরাংশে মেহদীপন্থীদের প্রভাব খুব বেশি ছিল। তাই গর্ডন মেহদীকে এক পত্র দিয়ে জানান যে তিনি তাঁকে দারফুর-কোরদোফান সালতানাতের সুলতান বানাতে চান।

যাই হোক, মেহদীপন্থীরা গর্ডনের এই প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য ঠিকই ধরতে পেরেছিল। বৃটিশ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার পর মেহদীপন্থীরা ১৮৮৪ সালে খার্তুন অবরোধ করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময়ে মেহদী মোহাম্মদ আহমেদ সুদানে একাধিক আমূল সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ঘোষিত "ইসলামিক ন্যায়নীতির" পরিকল্পনা আংশিকভাবে বাস্তবায়িত করেন। তিনি তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও ইয়েমেনের মুসলিম শাসকদের কাছে দূত প্রেরণ করেন এবং মক্কার শেরিফের সাথে পত্রবিনিময় করেন। আরো উল্লেখ্য যে, মোহম্মদ আহমেদ নিজে সুন্নী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তেহরানে শিয়া মুসলমানদের মসজিদে ইমামতি করার প্রস্তাব করেন।

১৮৮৫ সালের ২৩শে জানুয়ারি মেহদীর বাহিনী খার্তুম মুক্ত করে। খার্তুমের ঐ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে গর্ডন নিহত হন।

পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিশারদরা প্রচার করে থাকেন যে জেনারেল গর্ডনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়। এই অমূলক কাহিনী ইসলাম-বিরোধী উপনিবেশবাদী প্রচারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, মেহদী গর্ডনকে জীবিতাবস্থায় গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন গর্ডনকে বিনিময় করে নির্বাসিত আহমদ উরাবিকে মুক্ত করতে। ইসলামী সুদান রাষ্ট্রের নেতা মিশরের জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থানের নেতাকে যেকোন মূল্যে মুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন। উপনিবেশবিরোধী মুসলিম সংহতির জন্যেই তিনি এটা করতে চেয়েছিলেন। এ থেকে এই প্রচারণাও মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে মেহদীপন্থীরা মিশরীয়দের প্রতি অন্ধ ঘৃণা পোষণ করতো।

বৃটিশ উপনিবেশবাদী বাহিনীকে বিতাড়িত করার পর সুদান একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সুদানে মুসলিম রাষ্ট্র গঠন এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ঔপনিবেশিক শক্তি গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে অর্জিত মেহদীপন্থীদের বিজয় সারা মুসলিম বিশ্বে এক

অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়।

১৮৮৫ সালের জুন মাসে মেহদী ইন্তেকাল করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুসারী আবদুল্লাহ তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই তিনি সাধারণ মানুষের উপর আরোপিত কর হ্রাস করেন, কৃষক ও বেদুঈনদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ছোট-খাটো ফ্যাক্টরী স্থাপনে অগ্রসর হন। তিনি ওমদুরমান-এ মেহদীর স্মৃতিতে এক অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করেন। এটা পরবর্তীতে মুসলমানদের এক অন্যতম প্রধান মাযার শরীফে পরিণত হয়।

লন্ডন শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে সুদানে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের জাতিসমূহকে ঔপনিবেশিক নীতি প্রতিরোধে উৎসাহিত করবে। আর তাছাড়া, শতাব্দীর শেষভাগে এসে পারস্য, অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন আরব অঞ্চল, মিশর ও বৃটিশ-ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপনিবেশবিরোধী চেতনা বিশেষ-ভাবে জোরদার হয়ে উঠেছিল। সুদানের দৃষ্টান্ত তাদের এই চেতনাকে আরো বেগবান করবে। এসব কারণে বৃটিশরা সুদানের মেহদীপন্থী-দের ক্রমশঃ ভেতর থেকে ক্ষয় করে করে অবশেষে সামরিকভাবে পরাস্ত করতে উঠে পড়ে লাগে।

মোহাফেজখানার দলিলপত্র থেকে দেখা যায়, খলিফা আবদুল্লাহর অধীনে কর্মরত ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ বৃটিশ গুপ্তচরদের নির্দেশ মতো কাজ করে। তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করে ভেতর থেকে মেহদীপন্থী রাষ্ট্রের "পতন" ঘটাতে। তারা উত্তর সুদানের নাইলোটিক উপজাতি ও আরব জনগণের মধ্যে, বেদুঈন ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের মধ্যে বিরোধ উস্কে দেয়।

১৮৮৭ সালে বৃটিশরা বোগোসোকে কেন্দ্র করে সুদান ও ইথিও-পিয়ার মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়ে দিতে সমর্থ হয়। কাসালার সীমান্তে অবস্থিত বোগোসো ছিল পূর্ব সুদানের এক প্রধান গুরুত্ব-পূর্ণ কেন্দ্র। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায় একশ' বছর পর, এখনো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা (সি. আই. এ.) ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই এলাকাকে নিয়ে একই খেলা খেলছে।

সুদানে সম্ভাব্য সকল উপায়ে জাতিগত ও উপজাতীয় বিরোধ উস্কে দেয়ার পাশাপাশি বৃটিশ এজেন্টরা পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যা নিয়ে সুদানের অভ্যন্তরে সৃষ্ট মতবিরোধেও ইন্ধন জোগাতে থাকে।

মেহদীবাদের মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা নিয়েও মতবিরোধ সৃষ্টিতে তারা নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে। খলিফা আবদুল্লাহর ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের দক্ষিণপন্থী, অর্থাৎ রক্ষণশীল অংশের উপর ভর করে তারা এই কাজে অগ্রসর হয়। রক্ষণশীল অংশের চাপে একাধিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মেহদী ও তাঁর খলিফাদের বক্তব্যের যেকোন সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর ফলে সুদানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে ওঠে।

একাধিক মুসলিম দেশে ভেতরে থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টকে নস্যাৎ করার একই ধরনের প্রচেষ্টা যে পাশ্চাত্যের গুপ্তচর সংস্থাগুলো এখনো চালিয়ে যাচ্ছে সেটা অনেকেরই জানা আছে।

১৮৯৬ সালে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা সুদানকে বিচ্ছিন্ন করার, সুদানের সাথে তার প্রতিবেশীদের সম্পর্ক খারাপ করে তোলার, এবং সুদানের অভ্যন্তরের মতবিরোধ তীব্রতর করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল সুদান আক্রমণ করা।

লন্ডন ১৮৯৬ সালে সুদান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ ১৮৯৫ সালে ইটালীয়রা ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত হয়। বৃটিশ শাসকচক্র অনুধাবন করে যে মাত্র এক দশকের মধ্যে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় দুই ঔপনিবেশিক শক্তির—গ্রেট বৃটেন ও ইটালীর, পরাজয় আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে অবশ্যম্ভাবীভাবে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করবে।

১৮৯৬ সালেই বৃটিশদের সুদান আক্রমণের আর একটি কারণ ছিল এই যে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আটলান্টিক উপকূল থেকে ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত আফ্রিকান সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে দ্রুত অগ্রসর করে নিচ্ছিল। ১৮৯৬ সালেই ফরাসীরা ক্যাপ্টেন মারচাঁর নেতৃত্বে উবাঙ্গী নদীর উপত্যকা থেকে শাদ হয়ে দক্ষিণ সুদান ও ফাচোডা অভিমুখে সামরিক অভিযান চালায়।

তাই, ১৮৯৬ সালে বৃটিশ জেনারেল কিচেনারের নেতৃত্বে এক ইঙ্গ-মিশরীয় বাহিনী সুদান আক্রমণ করে। এই বাহিনী সেই সময়কার সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে (যেমন ম্যাক্সিম মেশিনগান) সজ্জিত ছিল। জেনারেল কিচেনারের বাহিনী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে বৃটিশ প্রকৌশলীরা দক্ষিণ মিশর থেকে উত্তর সুদান পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের কাজে হাত দেয়। বৃটিশ নৌবাহিনীর ছোটখাটো জাহাজগুলো নীলনদে প্রবেশ করে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর ওপর বোমা বর্ষণ

করে। তাছাড়া এসব নৌযান বৃটিশ-মিশরীয় বাহিনীর জন্যে রসদ পরিবহণের কাজেও ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর কিচেনারের বাহিনী মেহদীপন্থী রাষ্ট্রের রাজধানী ওমদুরমানের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। আর এখানেই সংঘটিত হয় সেই নিয়ামক যুদ্ধ। ওমদুরমান দখলের পর আগ্রাসকরা লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের প্রিয় মেহদীর মাযারকে অপবিত্র করে। মৃত মেহদীও সাম্রাজ্যবাদীদের মনে এতো ত্রাসের কারণ ছিল যে তারা মাযার শরীফ অপবিত্র করতেও কুন্ঠাবোধ করেনি।

১৮৯৯ সালে, মেহদীপন্থীদের পরাভূত করার পর, বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা সুদানে তথাকথিত ইঙ্গ-মিশরীয় দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মিশরের খেদিভের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। সুদানে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, চুক্তিবলে, মিশরকে সুদানের প্রশাসন পরিচালনার সব ব্যয়ভার বহন করতে হয়। তবে, আদায়কৃত রাজস্বের সিংহভাগই চলে যায় বৃটিশ কোষাগারে আর বৃটিশ একচেটিয়া কারবারীদের পকেটে। বৃটিশ বণিকরা মিশর ও সুদানের উন্নতমানের তুলা ব্যবসার উপর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। অদ্ভুত ব্যবস্থা এই দ্বৈত শাসন মিশর ও সুদানের মধ্যে বহু বছরের জন্য সম্পর্ক খারাপ করে রাখে। দ্বৈত শাসনের অংশীদার হিসেবে এবং দুই দেশের মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে সাহায্য করার ছুতোয়ও বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা মিশর ও সুদান, এই দুই মুসলিম রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, তার পর থেকে এই মাত্র ১৯৫৬ সালে এসে সুদানের জনগণ বৃটিশদের শক্ত থাবা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়। তবে, বৃটিশরা জাতিগত, উপজাতীয়, ধর্মীয় ও ভূখন্ডগত বিরোধের যে বিষাক্ত বীজ বপন করেছিল তার পরিণতির জের হিসেবে সুদান ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ এখনো মাঝে মধ্যেই ঘটতে দেখা গেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, এর ফলে সুদানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বারবার উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আহমদ শাহ দুররানী মধ্যপ্রাচ্যের পূর্বাংশ আর দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চিমাংশ নিয়ে আফগানিস্তান গঠন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা হিন্দুস্থানের এক উল্লেখযোগ্য অংশকেও পদানত করে। তারা মিসর ও সুদান দখলের পাশাপাশি এদিকে ধীরে ধীরে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশেরও চেষ্টা চালায়।

প্রথম দিকে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টরা আহমদ শাহ কর্তৃক আফগানিস্তান গঠনকে স্বাগত জানায়। তারা আহমদ শাহ-র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তাঁকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে প্ররোচিত করে, কারণ মারাঠারা এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়লে সেটা মধ্যে ভারতে বৃটিশ অবস্থান জোরদার করার সহায়ক হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্ট্র্যাটেজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে উপনীত হওয়ার পর অনুধাবন করে যে আফগান রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শক্তি তাদের জন্যে হুমকি হয়ে উঠছে। বৃটিশ এজেন্টরা তাই আফগানিস্তানের আমির ও শিখ রাজ্যের শাসক রণজিৎ সিংহের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ উস্কে দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। রণজিৎ সিংহ পশতুনদের এক অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পেশওয়ার দখল করে নেন।

এর পাশাপাশি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ও গুপ্তচররা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সক্রিয় হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা আফগানিস্তানের শক্তিশালী শাসক দোস্ত মহম্মদকে (তিনি আমির উপাধি গ্রহণ করেন) উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

১৮৩৮ সালের অক্টোবরে ভারতে গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড এক ইশতেহার প্রকাশ করেন। ইশতেহারটির বক্তব্য ছিল খুবই জঘন্য। ইশতেহারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সাহায্যে দোস্ত মোহম্মদকে উৎখাত করে তাঁর জায়গায় ব্রিটিশদের দালাল সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসানোর কথা বলা হয়। ১৮৩৮ সালের শেষভাগে বৃটিশ বাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বৃটিশ বাহিনী ১৮৩৯ সালের আগস্ট মাসে কাবুল দখল করে। অবশ্য কাবুল দখলের এই যুদ্ধেও বৃটিশরা

আফগানিস্তানের স্থানীয় ভূস্বামীদের পরস্পর বিরোধকে কাজে লাগায় এবং ভীতি প্রদর্শন ও উৎকোচ প্রদানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের চিরাচরিত কৌশল হিসেবে।

তবে, কাবুলের পতনের পর আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ বৃটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। দেশপ্রেমিকরা বিশ্বাসঘাতক সুজাকে গুলি করে হত্যা করে। ১৮৪২ সালের জানুয়ারি-মার্চ মাসে কাবুলে অবরুদ্ধ বৃটিশ বাহিনী অবরোধ ভেঙে বের হয়ে এসে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে ফিরে যাবার চেষ্টা করলে আফগানদের হাতে সমূলে ধ্বংস হয়।

ভারতের নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবোরো ১৮৪২ সালের আগস্টে কাবুল দখলের উদ্দেশ্যে আরো একটি বিশাল সুসজ্জিত বৃটিশ বাহিনী প্রেরণ করে। বৃটিশ বাহিনী কাবুলে উপনীত হয়ে শহরটির এক বিরাট অংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং হাজার হাজার বেসামরিক লোককে হত্যা করে। বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা বিশ্বাসঘাতক সুজার পুত্র ফতেহ জঙ্গ ও শাপুরকে পর পর কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

যাই হোক, এতদসত্ত্বেও বৃটিশরা আফগান জনগণের দেশপ্রেমমূলক চেতনাকে নস্যাৎ করতে ব্যর্থ হয়। দেশের সর্বত্র থেকে জনগণের স্বেচ্ছাবাহিনী কাবুল অভিমুখে অভিযান শুরু করে। মুসলিম ধর্মনেতারাও বৃটিশ উপনিবেশবাদ ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ১৮৪২ সালেরই শেষদিকে শাপুর কাবুল থেকে পলায়ন করে এবং আমির দোস্ত মোহম্মদ রাজধানীতে ফিরে আসেন।

১৮৭০-এর দশকের শুরুতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা মুসলিম প্রাচ্যের সকল অঞ্চলে—মিশরে, পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় ও পারস্যে অনুসৃত তাদের নীতিতে নতুন গতিবেগ প্রদান করে। তারা আর একবার আফগানিস্তানে অভিযান পরিচালনার সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। এবারে এই প্রস্তুতি নেয়া হয় ভারতকে রুশ হুমকির হাত থেকে রক্ষা করার অজুহাতে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ও স্পষ্টত আগ্রাসনমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই বৃটিশরা পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে। ১৮৭৭ সালের ২২শে জুন তারিখে রাণী ভিক্টোরিয়াকে (এক বছর আগে ভিক্টোরিয়াকে ভারতেরও রাণী ঘোষণা করা হয়) লেখা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ডিজরেইলির এক চিঠি থেকেই এটা বোঝা যায়। "লর্ড বেকনসফিল্ডের বর্তমান অভিমত

হচ্ছে...রাশিয়াকে ভারত থেকে আক্রমণ করা উচিত। আর সেজন্যে পানস্য উপসাগরে সেনাবাহিনী পাঠানো উচিত। আমরা চাই ভারতের রাণী তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিন মধ্য এশিয়া থেকে রুশদের বিতাড়িত করে কাস্পিয়ান সাগরের দিকে হটিয়ে দিতে।"

১৮৭৮ সালের নভেম্বরে বৃটিশ বাহিনী আবার আফগানিস্তান আক্রমণ করে। ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে আমির শের আলী খান রাজধানী কাবুল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা শের আলী খানের পুত্র ইয়াকুবকে সিংহাসনে বসায়। ১৮৭৯ সালের মে মাসে বৃটিশরা তাকে বাধ্য করে সম্পূর্ণ প্রতিকূল শর্তে এক চুক্তি সম্পাদন করতে। ইতিহাসে গানদামাক চুক্তি হিসেবে পরিচিতি এই চুক্তিতে বস্তুতপক্ষে আফগানিস্তানকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু, আফগানিস্তানের জনগণ আবারো গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চুক্তিতে বৃটিশ পক্ষের স্বাক্ষরদাতা কাভাগনারি আফগানদের হাতে নিহত হয়। এই পরিস্থিতিতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ লেফটেন্যান্ট-জেনারেল রবার্টস-এর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে আরো সৈন্য প্রেরণ করে। আক্টোবরে বৃটিশরা কাবুল দখল করে নেয়। তারা কাবুলকে এবারো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। প্রখ্যাত দুর্গ, বালা হিসারও বৃটিশদের আক্রমণে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপনিবেশবাদীদের ধ্বংসযজ্ঞ আফগান জনগণের মনে বৃটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণা জাগ্রত করে এবং তারা মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জেনারেল মুহাম্মদ জান খান। প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও আন্দোলনে শরীক হন এবং তাঁরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশগ্রহণের জন্যে জনগণের প্রতি আহবান জানান।

১৮৭৯ সালের ডিসেম্বরে, দশ বছর ধরে সমরকন্দে নির্বাসিত, শের আলী খানের ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রহমান খান দেশে ফিরে আসেন। ১৮৮০ সালে বৃটিশরা পরাজয় বরণ করার পর আব্দুর রহমান খানকে আফগানিস্তানের আমীর হিসেবে স্বীকৃতি দান করতে বাধ্য হয়। তবে, আবদুর রহমানকে গানদামাক চুক্তির কয়েকটি ধারা মেনে নিতে হয়। ফলে আভগানিস্তানের বিদেশ নীতি ইঙ্গ-ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতেই থেকে যায়। ১৮৯৩ সালে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জটিলতার সুযোগ নিয়ে আব্দুর রহমানকে বাধ্য করে এক সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে। এবং ঐ চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়

ডুরান্ড লাইন। চুক্তির ফলে পশতুন অধ্যুষিত আফগানিস্তানের এক বিরাট অংশ বৃটিশদের অধিকারে চলে যায় এবং বৃটিশরা গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের নীতি আফগান জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে, আব্দুর রহমান খানের পুত্র হাবিবুল্লাহ খান, যিনি ১৯০১ সাল থেকে দেশ শাসন করে আসছিলেন, নিহত হন। প্রিন্স আমানুল্লাহ খান তখন ক্ষমতা লাভ করেন। ক্ষমতালাভের পর পরই আমানুল্লাহ খান বৃটেনের সাথে সম্পাদিত দাসত্বমূলক সব চুক্তি, বিশেষ করে গানদামাক চুক্তি, বাতিল করে দেন এবং দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিলে আমানুল্লাহ খান ভ্লাদিমির লেনিনের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন।

স্বাধীনতা ঘোষণার প্রত্যুত্তরে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯১৯ সালের মে মাসে ২ লক্ষ সৈন্যের এক বৃটিশ বাহিনী তিনটি কলামে বিভক্ত হয়ে তিন দিক থেকে আফগানিস্তানে আক্রমণ চালায়। যুদ্ধে তারা গোলন্দাজবাহিনী ও বিমানবাহিনীও মোতায়েন করে। কিন্তু, বৃটিশদের বিরুদ্ধে সকল পশতুন উপজাতির দেশপ্রেমমূলক ও বীরত্বপূর্ণ লড়াই, সোভিয়েত রাশিয়ার নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন এবং ট্রান্সকা-স্পিয়ান অঞ্চলে লাল ফৌজ কর্তৃক হস্তক্ষেপকারীর বৃটিশ বাহিনীর পরাজয় বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের বাধ্য করে ১৯১৯ সালের ৮ই আগস্ট রাওয়ালপিন্ডিতে এক প্রাথমিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে। এই চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশরা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা মেনে নেয়।

১৯২১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত হয় সোভিয়েত-আফগান চুক্তি। এই চুক্তিই হলো আফগানিস্তানের প্রথম সমতাভিত্তিক আন্তর্জাতিক চুক্তি। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থনের নিশ্চয়তা বিধান করে এই চুক্তি আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সোভিয়েত-আফগান চুক্তিতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা দারুণ রুষ্ট হয়। তারা ১৯২০-এর দশকের মধ্যভাগে, আমানুল্লাহ খান ও তার সরকারকে উৎখাতের জন্যে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বৃটিশ এজেন্টরা গুজব রটনা শুরু করে যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-

ব্যবস্থা চালু করার সাথে সাথে আমানুল্লাহ খান সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবেন। আমানুল্লাহ সরকার ঘোষিত কৃষি সংস্কারের পদক্ষেপকে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উপর হামলা বলে চিত্রিত করা হয় এবং বিচার বিভাগীয় সংস্কারের পদক্ষেপকে শরিয়া আদালত লুপ্ত করার পদক্ষেপ বলে প্রচার চালানো হয়। এর পাশাপাশি, ইঙ্গ-ভারতীয় কর্তৃপক্ষ রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতা সুর বাজার ও তাঁর ভাই শের আগার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমানুল্লাহ খানের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বিরোধিতা করার কারণে শের আগা ১৯২০-এর দশকের গোড়া থেকে ভারতে নির্বাসিত হন।

বৃটিশরা আফগানিস্তানে সরকারবিরোধী তৎপরতায় জনগণকে উৎসাহিত করে এবং আফগানিস্তানের ধর্মীয় নেতাদের এই তৎপরতায় টেনে আনার প্রচেষ্টা চালায়। এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, প্রখ্যাত বৃটিশ প্রাচ্যবিশারদ ও গোয়েন্দা অফিসার কর্ণেল লরেন্স ১৯২৭ সালের জুন মাসে টমাস শ' নাম ধারণ করে রাজকীয় বিমান বাহিনীর একজন প্রাইভেট হিসেবে ভারতে আগমণ করেন। ভারতের জাতীয় মোহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিলপত্র থেকে আমি দেখেছি যে ১৯২৮ সালের জুন মাসে টি. ই. লরেন্স আফগান সীমান্তে অবস্থিত মিরাম শাহ শহরে যান। বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত এই মিরাম শাহ শহরটি এখনো ওয়াশিংটন ও লন্ডনের নির্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে গণতান্ত্রিক আফগান প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিবিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের আখড়া হিসেবে। উপরোক্ত দলিলপত্রে দেখা যায়, মিরাম শাহ শহরে পৌঁছেই লরেন্স উত্তর আফগানিস্তানের কুখ্যাত ডাকাত দলের সর্দার বাচা সাকুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বৃটিশ এজেন্টরা ১৯২৮-১৯২৯ সালে এক সরকারবিরোধী বিদ্রোহ ঘনিয়ে তোলে আমানুল্লাহ খানকে উৎখাত করে বাচা সাকুকে হাবিবুল্লাহ গাজী নামে আফগানিস্তানের আমীর হিসেবে ক্ষমতায় বসানোর উদ্দেশ্যে।

বাচা সাকুর রক্তলোলুপ শাসন, তার গভর্নর ও ভাইসরয়দের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ এবং মেহনতী মানুষের উপর নির্মম নির্যাতন ইত্যাদির ফলে আফগানিস্তানের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। সাধারণ মানুষ ও দেশপ্রেমিক মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের মনে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ১৯২৯ সালে প্রাক্তন আমানুল্লাহ খান সরকারের সমরমন্ত্রী নাদির খানের নেতৃত্বে বাচা সাকুর বিরুদ্ধে

তীব্র সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে বাচা সাকুর বাহিনীকে পরাজিত করে কাবুলে প্রবেশ করেন এবং আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা হাতে নেন। তাঁকে আফগানিস্তানের রাজা ঘোষণা করা হয়।

এর মধ্য দিয়েই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কে দেয়া রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের এই গৃহযুদ্ধ উস্কে দেয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল আমানুল্লাহ খানের প্রগতিশীল সরকারকে উৎখাত করা এবং আফগানিস্তানকে দুর্বল, এবং সম্ভব হলে খন্ড-বিখন্ড করা।

এই-ই হলো মুসলিম আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের শতবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জোট

১. জোটের ইতিহাস ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

১৮৯৭ সালে বিশ্ব ইহুদি সংস্থা (ওয়ার্ল্ড জিয়েনিস্ট অর্গানাই-জেশন ঃ ডব্লিউ. জেড. ও.) প্রতিষ্ঠার পরপরই এই সংস্থার নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্য থেকে পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পেতে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা সাম্রাজ্যবাদের মদদলাভে উঠে পড়ে লাগে। প্যালেস্টাইন তখন ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। ১৮৯৮ সালে জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের সাথে বাগদাদ রেলপথ স্থাপনের ব্যাপারে কনসেশন সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে অটোমান সাম্রাজ্য সফরের পরিকল্পনা নেন। ঐ সফরকালে তিনি জেরুজালেম ভ্রমণেরও সিদ্ধান্ত নেন। সফর শুরু হওয়ার আগে দিয়ে, বিশ্ব ইহুদি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা থিওডোর হের্জল বার্লিনে জার্মানির চ্যান্সেলর হোয়েনলোহ্ ও বিদেশ বিষয়ক রাষ্ট্র-সচিব ফন বালো-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা প্যালেস্টাইনে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি ইহুদিবাদী কোম্পানি গঠনের বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। হের্জল জার্মানির পৃষ্ঠাপোষকতায় ঐ কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব দেন। ঐ কোম্পানি গঠনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করা দূরের কথা, চ্যান্সেলর ঐ পরিকল্পনার প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ইহুদিবাদী-দের দাবিকৃত ভূখণ্ডের আরো উত্তর সীমানাকে ঐ পরিকল্পনার আওতায় আনার পরামর্শ দেন। হোয়েনলোহ্ সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন ঃ

"বৈরুত পর্যন্ত, নাকি তারও আরো উত্তর পর্যন্ত ?"

এই প্রশ্নের তাৎপর্য কতোখানি সেটা বোঝা যায় ১৯৮২ সালে ইসরায়েল কর্তৃক বৈরুত শহরের একটা অংশকে দখল করে নেয়ার ঘটনা থেকে। ইহুদিবাদীরা এখনো লেবাননের এক উল্লেখযোগ্য অংশ জোর করে নিজেদের দখলে রেখেছে।

যাই হোক, দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কাছ থেকে ইহুদিদের জন্যে প্যালেস্টাইনে উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতিসূচক ফরমান লাভে জার্মানির সম্রাট ব্যর্থ হন। এদিকে, ১৮৯৮ সালেই মক্কায় অনুষ্ঠিত হয় প্যান-ইসলামিক কংগ্রেস। ঐ কংগ্রেসে তুরস্কের সুলতানও সক্রিয় অংশ নেন। জার্মান কূটনৈতিক চাপের মুখে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ভাব দেখান যে তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের প্রবেশের অনুমতি দিতে পারছেন না বলে দুঃখিত। যদিও এ ব্যাপারে তিনি নিজেই রাজী ছিলেন না।

থিওডোর হের্জল ও তাঁর দোসররা তাই, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, গ্রেট বৃটেনের উপর ভরসা করতে মনস্থির করে।

জার্মানি যেক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছিল তুরস্কের সুলতানের সাথে সহযোগিতার পথ ধরে, সেক্ষেত্রে, ঠিক তার বিপরীত, বৃটিশ শাসকচক্র পরিকল্পনা আঁটছিল অটোমান সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে আরব ভূখন্ডকে তাদের নিজেদের পদানত করতে। তাই ইহুদিবাদীদের পক্ষে গ্রেট বৃটেনের সাথে একটা রফায় আসা তুলনামূলকভাবে সহজতর হয়।

১৯০২ সালে হের্জল লন্ডনে যান ব্যাংক ব্যবসায়ী নাথান রথসচাইল্ড ও উপনিবেশ বিষয়ক সচিব জোশেফ চেম্বারলেনের সাথে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে। হের্জল এল আরিশ এলাকাসহ সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ ও সাইপ্রাস দ্বীপ বিশ্ব ইহুদি সংস্থার অধীনে ন্যস্ত করার প্রস্তাব দেন। দেখা যাচ্ছে, ১৯৫৬ সালে ত্রীপক্ষীয় হামলার সময় ইসরায়েলের ট্যাংক বহর সিনাই-এ প্রবেশের এবং ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল কর্তৃক সিনাই পুনর্দখলের বহু আগে, এ শতাব্দীর শুরুতেই ইহুদিবাদীরা সিনাই উপদ্বীপ ও এল-আরিশের উপর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। ১৯৮২ সালে ইসরায়েল অবশ্য আরবদের জন্যে অবমাননাকর ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বিনিময়ে সিনাই মিশরকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্ব ইহুদি সংস্থার নেতৃবৃন্দ বিবদমান দুই পক্ষের সাথেই সমানভাবে তাল মিলিয়ে চলার

সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ব ইহুদি সংস্থার সদর দপ্তর বার্লিন থেকে নিরপেক্ষ কোপেনহেগেন-এ সরিয়ে নেয়া হলেও, সংস্থার কিছু কিছু কার্য-কলাপ বার্লিন থেকেই চালানো হয় এই উদ্দেশ্যে যে তারা অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে বার্লিনের মিত্রতাকে প্যালেস্টাইনে অনুপ্রবেশের পরিকল্পনাকে অগ্রসর করে নেয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে। তবে, বিশ্ব ইহুদি সংস্থার নতুন নেতা চেইম ওয়াইজমান লন্ডনে ঘাঁটি গাড়েন। তিনি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উভয় দেশের শক্তিশালী ইহুদি সংগঠনসমূহের উপর ভরসা করেছিলেন এই আশায় যে এসব সংগঠন ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে বসবাস স্থাপনের দাবি পূরণে লন্ডন ও ওয়াশিংটনকে রাজী করাতে সক্রিয় সহায়তা করবে।

বৃটিশ মোহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিলপত্র সন্দেহাতীতভাবে তুলে ধরে যে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের আরব দেশসমূহ দখল করার ও অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের অভিসন্ধি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৫ সালে বৃটিশ মন্ত্রিপরিষদ মুসলিম প্রাচ্যকে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে স্যার মরিস বুন-সেনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ গোপন কমিটি গঠন করে।

অবশ্য, ১৯১৪-১৯১৬ সালে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। ১৯১৫ সালে, বৃটিশ নৌবাহি-নীর তদানীন্তন সর্বাধিনায়ক (ফার্স্ট লর্ড অব দ্য এডমিরালটি) উইনস্টন চার্চিল ডার্ডেনালেস নিয়ন্ত্রণের জন্য এক অভিযান চালায়। কিন্তু মারমারা সাগরে উপনীত হতেই সেই অভিযান তুর্কীরা ব্যর্থ করে দেয়। একই সাথে অলেকজান্দ্রিয়ায় (ইসকেনদারুন) অবতরণ করে সিরিয়া ও লেবাননের উপকূল দখলের পরিকল্পনা নিয়েছিল বৃটিশরা।

পারস্য উপসাগর থেকে জেনারেল টাউন্সহেন্ডের নেতৃত্বে বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসরমান বৃটিশ বাহিনীও পরাজিত হয়। কুট আল-আমারাহ-এর (যেখানে ইরান ও ইরাকের বাহিনী এখন তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে) কাছে তুর্কী বাহিনী জেনারেল টাউন্সহেন্ডের বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। এই পরাজয় মুসলিম প্রাচ্যে বৃটেনের মর্যাদাকে ধুলায় লুটিয়ে দেয়। এটা আরো বড়ো হয়ে দেখা দেয় এ কারণে যে ঠিক তখনই তুরস্কের ৬ষ্ঠ আর্মি ও প্যালেস্টাইন থেকে সুয়েজ খাল অঞ্চলের বৃটিশ ঘাঁটির

দিকে আক্রমণাভিযান শুরু করে।

এই পরিস্থিতিতে সিরিয়া ও হেজাজের আরব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে লন্ডন গোপন আলাপ-আলোচনা শুরু করে। বৃটিশরা অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাতে আরবদের উৎসাহিত করে এবং বিনিময়ে যুদ্ধের পর আরবদের স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯১৫ সালের মে মাস থেকে ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মিশরে নিযুক্ত বৃটেনের প্রথম হাই কমিশনার স্যার আর্থার ম্যাকমেহন এবং মক্কার শেরিফ ও হেজাজের শাসক হুসেন আল-হাশিমীর পুত্র আমির ফয়সলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলে। উভয় পক্ষ এই মর্মে মতৈক্যে উপনীত হয় যে (সিরিয়ার নেতৃবৃন্দের সমর্থনে) বৃটেন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন (বৈরুত বাদে), প্যালেস্টাইন, হেজাজ ও আরব উপদ্বীপ সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন আরব রাষ্ট্র স্বীকার করে নেবে, এবং অপরদিকে আরব নেতৃবৃন্দ তুরস্কের সেনাবাহিনীতে কর্মরত আরব সৈনিকদের দিয়ে বিদ্রোহ সংঘটিত করবে। আরবরা অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন আরব এলাকায় আরব উপজাতিদের বিদ্রোহ ঘোষণারও প্রতিশ্রুতি দেয়।

আরব বিদ্রোহ, সন্দেহাতীতভাবে, তুর্কীদের হাতে বৃটিশ বাহিনীর পরাজয় রোধ করে এবং অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আঁতাত শক্তির বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আরবদের দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

১৯১৫ সালের শেষার্ধে বৃটিশ কূটনীতিবিদরা আরব প্রাচ্যকে খন্ড-বিখন্ড করার এক পরিকল্পনা নিয়ে ফরাসীদের সাথে গোপন আলাপ-আলোচনা শুরু করে। ১৯১৬ সালের ১৫ই মে বৃটিশ প্রতিনিধি কর্ণেল সাইকস ও ফরাসী দূত পিকঁ এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করে (সাইকস-পিক' চুক্তি)। চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স কর্তৃক পশ্চিম সিরিয়া, লেবানন ও সিলিসিয়া দখলের এবং ব্রিটেন কর্তৃক দক্ষিণ ও মধ্য ইরাক ও হাইফা ও আক্কা বন্দর পর্যন্ত প্যালেস্টাইনীয় এলাকা দখলের অধিকার ভাগাভাগি করে নেয়া হয়। প্যালেস্টাইনের বাকি অংশ রাখা হয় ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ প্রশাসনের আওতায়। পূর্ব সিরিয়া ও উত্তর ইরাককে ফ্রান্সের স্বার্থ বলয় এবং ট্রান্স-জর্দান ও বাগদাদ ওলায়েত এর উত্তরাংশকে বৃটেনের স্বার্থবলয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এভাবেই বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা আরব প্রাচ্যকে পাঁচটি ঔপনিবেশিক অঞ্চলে ভাগ করার ষড়যন্ত্র করে। তারা একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মক্কার শেরিফকে দেয়া প্রতিশ্রুতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার সাথে লঙ্ঘন করে।

২. বেলফোর ঘোষণার ইসলাম বিরোধী বৈশিষ্ট্য

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর, বিশেষ করে আরবদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জয়লাভের পর এই দেশগুলোকে নিয়ে, লর্ড কার্জনের ভাষায়, "আরব-ইন্ডিয়া" উপনিবেশ গঠন করা। তবে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে কিছু প্রতিকূল সামরিক ঘটনা ঘটার কারণে বৃটিশরা ১৯১৬ সালে আরব নেতৃবৃন্দ ও ফ্রান্সের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। এসব চুক্তি বৃটিশদের উপরোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আরবদের সাথে ও ফ্রান্সের সাথে সম্পাদিত পরস্পরবিরোধী চুক্তির বাস্তবায়ন রোধ করতে গিয়ে লন্ডন ইহুদিবাদীদের সঙ্গে হাত মেলানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেই ১৯১৬ সালেই বৃটিশ বিদেশ দপ্তর ইহুদিদের সাথে অবিলম্বে একটি মতৈক্যে উপনীত হওয়ার প্রশ্নে এক গোপন মেমোরানডাম তৈরি করে। মেমোরানডামে বলা হয়, যতো দ্রুত সম্ভব, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের অধিবাস বাড়ানো দরকার। দলিলে আরো বলা হয় যে প্যালেস্টাইনে বসবাসস্থাপনকারী ইহুদিদের সংখ্যা সেখানকার আরব জনসংখ্যার সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো পর্যায়ে পৌঁছুলেই তারা প্যালেস্টাইনের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হাত দিতে পারবে।

দেখা যাচ্ছে, বৃটেনের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যখন লক্ষ লক্ষ আরব জনগণ মক্কার শেরিফের ডাকে সাড়া দিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে ও প্যালেস্টাইনসহ একটি ঐক্যবদ্ধ ও একক আরব রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যে জেহাদ করছে, ঠিক তখনই বৃটিশ বিদেশ মন্ত্রণালয় ইহুদিবাদীদের সাথে শলা-পরামর্শ করছে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের রাষ্ট্র গঠনের বিষয় নিয়ে। তাছাড়া, বৃটিশ

কূটনীতিবিদরা ইহুদি "সংখ্যাগরিষ্ঠের" হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা নিয়েও একই সময়ে ঐ আলাপ-আলোচনাও চালায়। উল্লেখ্য যে, ১৯১৬ সালে প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী ইহুদি ও আরবদের অনুপাত ছিল ১ : ১৬।

এভাবে, আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে, লন্ডন শুধু ভবিষ্যৎ ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির পরিকল্পনাই নয়, সেই সাথে আরব প্যালেস্টাইনের অবিচ্ছেদ্য অংগ, জর্দান নদীর পশ্চিম পাড়ে ইহুদিবাদী নিয়ন্ত্রণ কায়েমের পরিকল্পনাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে।

১৯১৬-১৯১৭ সালে বৃটিশ শাসকচক্র ইহুদিদের সাথে প্রস্তাবিত রফাকে কেন্দ্র করে তিক্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। সরকারের মধ্যকার বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য আশংকা প্রকাশ করেন যে মক্কার শেরিফকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন ও ইহুদিবাদের সাথে যোগসাজশকে মুসলিম প্রাচ্যের নেতৃবর্গ খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে ধরে নেবে এবং এর ফলে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে।

এতদসত্ত্বেও, ইহুদিবাদের সাথে যোগসাজশের সমর্থকরাই ঐ বিতর্কে জয়ী হয়। এটা সম্ভব হয় অনেকাংশে মার্কিন প্রভাবের কারণে। লন্ডন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আতাঁতের পক্ষে যুদ্ধে টেনে আনার ব্যাপারে তখন খুবই উদগ্রীব ছিল।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সদস্য ও ইহুদিদের নেতা, লুইস ব্র্যানডিস, যিনি প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের আবার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, প্রেসিডেন্টকে ইহুদিবাদী পরিকল্পনার প্রতি সমর্থনদানে রাজী করান। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ইহুদিবাদী পরিকল্পনার পক্ষে মত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সেটা বৃটিশ সরকারকে জানানো হয়, এবং ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্থার জে. বেলফোর বৃটিশ ইহুদিদের নেতা লর্ড রথসচাইল্ডকে চিঠি দিয়ে জানান যে বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবে।

এটাই কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণা। এই ঘোষণার দৌলতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসকচক্র এক ঢিলে একাধিক পাখী মারতে সমর্থ হয়। প্রথমত, তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনতে পেরে ইহুদিদের পুরো সমর্থন লাভ করে। দ্বিতীয়ত, এই ঘোষণার অজুহাতে তারা ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে মক্কার শেরিফের

সাথে সম্পাদিত চুক্তি বেমালুম ভুলে যাওয়ার সুযোগ পায়। লন্ডন প্রকৃত প্রস্তাবে অবিচ্ছিন্ন আরব ভূখন্ডের মাঝে ইহুদিবাদী দেয়াল খাড়া করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল। প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মিশরকে সিরিয়া থেকে এবং লেবাননকে ট্রান্স-জর্দান ও হেজাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করারই একটা চাল ছিল। তৃতীয়ত, বেলফোর ঘোষণা সাইকস-পিক* চুক্তি ভন্ডুল করে আরব প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর একচ্ছত্র বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ কায়েমের পথও করে দেয়।

অপরদিকে, ওয়াশিংটন ও লন্ডনের সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থনে ইহুদিবাদীরাও, প্রকৃত ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের বহু আগেই, প্যালেস্টাইনকে "তাদের নিজস্ব শক্তিতে" পরিণত করার আইনগত ভিত্তি লাভ করে। তবে, এটুকুই তাদের কাছে যথেষ্ট ছিল না।

১৯১৮-১৯১৯ সালে ইহুদিবাদীরা "ইহুদিদের জাতীয় আবাস" কথাটার ব্যাপকতর ব্যাখ্যা দাবি করে। একই সাথে তারা ট্রান্স-জর্দান (বর্তমান জর্দান) ও লেবাননের ওপরও অধিকার দাবি করে। তাদের চাপে নতি স্বীকার করে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে ঘোষণা করেন যে মিত্র দেশগুলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণের পূর্ণ সমর্থনে, প্যালেস্টাইনে ভবিষ্যৎ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবে উড্রো উইলসন বেলফোর ঘোষণাকে "আরো এক ধাপ অগ্রসর" করেন। বেলফোর শুধু "ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমি" প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ইসলামিক সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্রভূমিতে, মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় জেরুজালেমসহ আরব মুসলিম অধ্যুষিত প্যালেস্টাইনে "ইহুদি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। উইলসনের ঘোষণার ভিত্তিতে বিশ্ব ইহুদি সংস্থার প্রতিনিধিগণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জকে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে প্যালেস্টাইনের উত্তর সীমান্তকে ইতানি নদী ও বানিয়াস শহর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রশ্নে আলোচনা অনুষ্ঠানে রাজী করান। এর অর্থ হলো, সমগ্র দক্ষিণ লেবানন ও গোলান পাহাড়শ্রেণীকে প্যালেস্টাইনের অন্তর্ভুক্ত করা।

১৯১৯ সালে চেইম ওয়াইজমান-এর (যিনি পরে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন) নেতৃত্বে বিশ্ব ইহুদি সংস্থার প্রতিনিধিদল প্যারিস

শান্তি সম্মেলনে একটি মেমোরানডাম আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করাতে সমর্থ হয়। ঐ মেমোরানডামে ভবিষ্যৎ ইহুদি রাষ্ট্রকে যাতে অর্থ-নৈতিক ও ভূখন্ডগত দিক থেকে টিকে থাকার উপযুক্ত করা যায় এবং ঐ রাষ্ট্রে যাতে পর্যাপ্ত পানিসম্পদ থাকে সেজন্য ইতানি নদী পর্যন্ত দক্ষিণ লেবাননকে পরিকল্পিত ইহুদি রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে লুইস ব্র্যান-ডিস, যিনি ইতিপূর্বে ইহুদিবাদী পরিকল্পনার পক্ষে উইলসনের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন, লয়েড জর্জকে প্রেরিত এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে ইতানি নদীর উপত্যকা, হেরমান পর্বত ও ট্রান্স-জর্দান, অর্থাৎ দক্ষিণ লেবানন, গোলান পাহাড়, দক্ষিণ সিরিয়ার অংশবিশেষ ও জর্দানের একটি অংশকে প্যালেস্টাইনের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে, বিশেষ করে ১৯৬৭ সালে গোলান পাহাড়, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা দখল এবং ১৯৮১-১৯৮৩ সালে লেবানন ও ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার বিরুদ্ধে আগ্রাসনের মধ্য দিয়েও ইহুদিবাদের সেই আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী প্রবণতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। লেবাননের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী সাদ হাদ্দা-দের প্রতি ইহুদিবাদের সমর্থন এবং লেবাননকে দ্বিখন্ডিত করার তেল আবিব ও ওয়াশিংটনের পরিকল্পনার মধ্য দিয়েও এই প্রবণতার অভিব্যক্তি ঘটছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদিবাদী জোট কর্তৃক উপ্ত বীজের এই-ই হলো ফসল।

১৯১৮ সালের এপ্রিলে বৃটিশ বাহিনী তুর্কীদের পরাজিত করে প্যালেস্টাইন দখল করার সাথে সাথে বিশ্ব ইহুদি সংস্থার নেতৃবৃন্দ তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে হাত দেয়। তাদের কার্যকলাপ বেলফোর ঘোষণার আওতাকেও ছাড়িয়ে যায়। চেইম ওয়াইজমান-এর নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে গঠিত হয় ইহুদিবাদী কমিশন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে কমিশন জাফায় এক সম্মেলন করে। ঐ সম্মেলনে প্যালে-স্টাইনের অস্থায়ী সরকারের মৌলিক করণীয় সুত্রায়িত হয়। সম্মেলনে প্যালেস্টাইনের নাম পরিবর্তন করে এরেৎস ইজরায়েল (ইসরায়েলের ভূমি) রাখার, এবং ইউনিয়ন জ্যাক-এর পরিবর্তে ইহুদিদের পতাকা উত্তোলনের দাবি করা হয়।

ইহুদিবাদী কমিশন এমনকি প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ সামরিক প্রশাসনের কাজেও হস্তক্ষেপ করে। ফলে সামরিক প্রশাসন কমিশনের কার্যকলাপ কিছুটা সীমিত করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহুদিবাদীরা দমবার পাত্র নয়। তারা ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে প্যালেস্টাইনে বেসামরিক প্রশাসন চালু করিয়ে নেয়। ব্রিটিশ সরকারের বেশ কয়েক বছরের সদস্য, হার্বার্ট স্যামুয়েলকে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে জেরুজালেমে হাই কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। বিশ্ব ইহুদি সংস্থার নেতা চেইম ওয়াইজমান বলেন, "আমরাই হার্বার্ট স্যামুয়েলকে এই পদে নিয়োগ করেছি। তিনি আমাদেরই স্যামুয়েল।"

১৯২০-এর দশকেই ইহুদিবাদীরা প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশ বেসামরিক সরকারকে নিজেদের স্বার্থে পুরো কাজে লাগায়। তারা প্যালেস্টাইনের অর্থনীতির ওপর, বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইহুদিদের পুঁজি আকৃষ্ট করে। কিবুৎস-এর আড়ালে তারা প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন এলাকায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। অর্থের জোরে এবং উৎকোচ, প্রতারণা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইহুদিবাদীরা প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দাদের আপন বাসভূমি থেকে উৎখাতের পরিক্ষেপ নেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সময় থেকেই তারা তাদের "নিজস্ব শক্তি" গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। এসব তৎপরতা, স্বাভাবিক ভাবেই, প্যালেস্টাইনের আরব জনগণ ও অন্যান্য মুসলিম দেশের জনগণের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

মুসলিম দেশসমূহে ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন রোধ করার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ বিষয়ক সচিব, উইনস্টন চার্চিল ১৯২১ সালের মার্চ মাসে কায়রোতে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদের সাথে এক গোপন বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকে কূটনীতিবিদ, গোয়েন্দা অফিসার, প্রাচ্যবিশারদ ও ইসলাম ধর্ম বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করে। বৈঠকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ বিষয়ক নতুন নীতি স্থির করা হয়।

মুসলিম দেশসমূহের জনগণের মনে ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর ক্রমাগত উপস্থিতিতে অসন্তোষ দিন দিন বাড়ছিল। তাই উইনস্টন চার্চিল ও পূর্বোল্লেখিত টি. ই. লরেন্সের উদ্যোগে দখলদার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে তার জায়গায় সেই আমলের "ডেটারেন্ট" হিসেবে পরিগণিত বিমান নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু বিমান তখনো প্রাচ্যে অপরিচিত ছিল তাই বিমানের কার্যকারীতা জনগণের সামনে প্রদর্শন করে জনগণকে ভয় পাইয়ে দেয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। দক্ষিণ ইরান, ইরাক ও পারস্য উপসাগরীয় উপকূলের বিভিন্ন আমিরাতে হাজার হাজার স্থানীয় অধিবাসীদের সামনে বিমানের ধ্বংস-ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যে বিমান থেকে বোমাবর্ষণের মহড়ার আয়োজন করে ব্রিটিশরা।

একই সাথে মুসলমানরা যাতে খুব বেশি বিক্ষুব্ধ না হয় সেজন্যে ইহুদিবাদীদের দৌরাত্ম কমানোর ব্যবস্থাও নেয়া হয়। যেমন, জর্দান নদীর ওপারের এলাকাকে ট্রান্স-জর্দান আমিরাতের অংশে পরিণত করা হয়। অবশ্য, সেটাও ছিল ব্রিটিশদের আশ্রিত রাজ্য। এই এলাকায় ইহুদিদের জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়।

তবে এসব পদক্ষেপ প্যালেস্টাইনকে খুব একটা প্রভাবিত করেনি। প্যালেস্টাইন ঠিকই ইহুদিবাদের আবাস হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে জেরুজালেম ও জর্দানের পশ্চিম তীরের আরো কয়েকটি ফিলিস্তিনী শহর সফরের সময় উইনস্টন চার্চিল আরব নেতৃবর্গ কর্তৃক উত্থাপিত জাতীয় সরকার নির্বাচনে ফিলিস্তিনী আরবদের অধিকার প্রদানের দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি উপহাস করে বলেন যে তাঁর নাতি-নাতনীরাও এখানে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে দেখতে পারবে বলে তিনি মনে করেন না।

প্যালেস্টাইনেও ইহুদিবাদবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন বাড়তে থাকে। ১৯২০ সালে আরব ফিলিস্তিনী কংগ্রেস ও ১৯৩৬ সালে সুপ্রিম আরব কাউন্সিল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে। ১৯২৯, ১৯৩৩ ও ১৯৩৬ সালে ইহুদিবাদবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনে সমগ্র প্যালেস্টাইন কেঁপে ওঠে। এসব আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা বাধ্য হয় প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের প্রত্যাবাসন কিছুটা হ্রাস ও ইহুদিবাদীদের যথেচ্ছাচারী শাসন সীমিত করতে।

তবে বিশ্ব ইহুদি সংস্থাও পালটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা আরব-ইহুদি বিরোধে উস্কানী দিতে থাকে। তাই আরব-ইহুদি বিরোধ মাঝে মাঝেই সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেয়া শুরু করে। জিউইশ লেজিয়ন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ফ্যাসিস্ট মনোভাবসম্পন্ন কট্টর ইহুদিবাদী ভি. জাবোতিনস্কির দলবল এইসব সশস্ত্র সংঘর্ষে বিশেষভাবে অংশ নেয়। উল্লেখ্য যে, এই ভি. জাবোতিনস্কিই ছিল ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের শিক্ষক ও আরাধ্য পুরুষ।

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে প্যালেস্টাইনে আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ইহুদিবাদীরা ফ্যাসিস্ট শক্তিসমূহের সাথেও যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। তাছাড়া, বিশ্ব ইহুদি সংস্থা অক্ষশক্তির সাথে তার সম্পর্ককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনের ওপর চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করতে চায়।

৩. ইটালির ফ্যাসিস্ট ও জার্মান নাৎসিদের সাথে ইহুদিবাদের মিত্রতা

বিশ্ব ইহুদি সংস্থার দুই প্রধান নেতা ওয়াইজমান ও গোল্ডমান ১৯৩০-এর দশকে মুসোলিনির সাথে একাধিক বৈঠকে মিলিত হন। ওয়াইজমানের মতে, মুসোলিনি তাঁদের সাথে অসামান্য সহযোগিতা করেন। মুসোলিনি প্যালেস্টাইনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন এবং সিভিতাভেচিয়াতে ইহুদিদের গোপন নৌ-প্রশিক্ষণ স্কুল চালানোর অনুমতি প্রদান করেন। নৌ-প্রশিক্ষণ স্কুলটি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এই স্কুলেই ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ ডেস্ট্রয়ার ক্যাপ্টেন ও টর্পেডো বোট ক্যাপ্টেনরা প্রশিক্ষণ লাভ করে। এরাই পরবর্তীতে বিভিন্ন আরব সাগরে আরব ট্যাংকারের ওপর দস্যুসুলভ হামলা চালায়।

নাৎসিরা ইহুদিবাদের সাথে এমনকি আরো বেশি সহযোগিতা করে। ১৯৩৩ সালে জার্মান রাইখসব্যাংক ও জিউইশ এজেন্সি এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইহুদিবাদীরা ঐ চুক্তির সাংকেতিক নাম দেয় "হাভারা"—বাণিজ্যিক এসোসিয়েশন। চুক্তির ধারা অনুযায়ী, জার্মানি থেকে যেসব ইহুদি প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসবাস করবে তাদেরকে জার্মানিতে তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মান পণ্য নিয়ে যাওয়ার অধিকার দেয়া হয়। এসব পণ্য সাধারণত তারা প্যালেস্টাইনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতো এবং বিক্রিলব্ধ আয়ের একটা অংশ তারা ইহুদিবাদের তহবিলে জমা দিত। এভাবেই গড়ে তোলা হয় ইহুদিবাদের তহবিল। ১৯৩৭ সালে রাইখসব্যাংকের প্রেসিডেন্ট থালমার শাখট-এর উদ্যোগে (অবশ্যই হিটলারের অনুমোদনক্রমে) হাভারার কার্যক্রমের আওতা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রসারিত করা হয়।

ইহুদিবাদীরা এইভাবে যে ব্রিটেনের শাসক মহলের কাছ থেকে বেলফোর ঘোষণা লাভ করে মধ্যপ্রাচ্যে তারই অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত হানে খোদ ব্রিটেনেরই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে পাওয়া পণ্যের সাহায্যে।

হাভারা চুক্তিতে একটি খুব গোপন ধারা ছিল। বিশ্ব ইহুদি সংস্থা,

প্যালেস্টাইনে সক্রিয় আধা-সরকারী ইহুদিবাদী বাহিনী ও হাভারার নেতৃবৃন্দেই শুধু ঐ ধারাটার কথা জানতো। ঐ ধারায় বলা হয় যে ক্ষতি-পূরণ হিসেবে ইহুদিদের নাৎসিরা যে পণ্য দেবে তার মধ্যে থাকবে গ্রেনেড, সাব-মেশিনগান, মেশিনগান ও মর্টার। তৃতীয় রাইখ গোপনে প্যালেস্টাইনে যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ দিয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল মধ্য-প্রাচ্যে ইহুদিবাদী "রাইখ" গঠন করা। ঐ অস্ত্রশস্ত্র প্যালেস্টাইনের আরব জনগণ ও আরব প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ উভয়ের জন্যেই মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেয়। এরই মধ্যে হিটলার ও গোয়েবলস ইসলামের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করে মুসলিম প্রাচ্যের জাতিসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য প্রদানের ঘোষণাও দিয়ে বসেন। ঐ সময়ে ওয়াইজমান ও গোল্ডমান আবার লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে বিশ্বের সামনে সমুপস্থিত প্রধান হুমকির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গোপন বৈঠকও করেন।

মধ্যপ্রাচ্যে তাদের লুণ্ঠনাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইহুদিবাদী নেতৃবৃন্দের শুধু অর্থ (পাউণ্ড-স্টার্লিং, ডলার অথবা মার্ক যাই হোক না কেন) আর অস্ত্রেরই দরকার হয়নি, কামানের খাদ্যও তাদের লেগেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা ১৯৩৩ সালে এস. এস.-এর অধীন স্পেশাল সেকশন দুই-১১২-এর প্রধান মাইল্ডেনস্টাইনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। হিমলারের বিভাগে "ইহুদী সংক্রান্ত নীতি" তৈরি করার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মাইল্ডেনস্টাইন ইহুদিবাদীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। তিনি এমনকি বিশ্ব ইহুদি সংস্থার কংগ্রেসেও যোগ দেন।

জিউইশ এজেন্সী ও সেকশন দুই—১১২-এর মধ্যে সম্পাদিত এক গোপন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তি ও রাজনৈতিক যোগ্যতার বিচারে প্যালেস্টাইনে পাঠানোর উপযুক্ত জার্মান ইহুদি নির্বাচনের জন্যে বার্লিনে জিয়নিস্ট প্যালেস্টাইন অফিস খোলা হয়। আরবদের সাথে সম্পর্কের অবনতি রোধ করার কৌশল হিসেবে নাৎসি কর্তৃপক্ষ দেশত্যাগী জার্মান ইহুদিদের আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ল্যাটিন আমেরিকান দেশের ভিসা প্রদান করতো। জার্মান ইহুদিরা ব্রাজিল অথবা আর্জেন্টিনাগামী জাহাজে করে জার্মান ত্যাগ করতো। কিন্তু জাহাজ আজোরস সাগরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তারা জার্মান ক্যাপ্টেনদের জ্ঞাতসারেই গোপনে প্যালেস্টাইন-গামী জাহাজে গিয়ে উঠতো। এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে যাত্রী স্থানান্তরিত হতো রাতের অন্ধকারে, যাতে কারো নজরে না পড়ে। ১৯৩৩

থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে প্রধানত এই ভাবেই ৪০,০০০ ইহুদি জার্মানি থেকে প্যালেস্টাইনে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে মুসলিম প্রাচ্যে ব্রিটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশবাদী নীতির লক্ষ্য, গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিবাদী লবির তৎপরতা, ইহুদিবাদ ও নাৎসি বিশেষ সর্ভিসের গোপন যোগাযোগ এবং হাভারা ও পরবর্তীতে ইসরায়েলী সেনাবাহিনীর গঠন ও সমরসজ্জা ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, আরব জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সকল পর্যায়ে ইহুদিবাদের পরিকল্পনা গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্রের স্বার্থকেই পূরণ করেছে। ইহুদিবাদের সকল পরিকল্পনা সব সময় প্রণীত হয়েছে উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আরবদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে রোধ করার উদ্দেশ্যে। উভয়ের এই সাধারণ স্বার্থই সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের মৈত্রীর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। গত চার দশকের ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপে এ কথার সত্যতারই প্রমাণ তুলে ধরে।

৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের সেবায় ইসরায়েল

একথা সত্যি যে ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে সংঘটিত প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইসরায়েলকে সমর্থন করে আর ব্রিটিশরা সমর্থন করে তাদের হাতের পুতুল, ট্রান্স-জর্দানের সামন্তবাদী আমির আব্দুল্লাহকে। তবে, মার্কিন কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেউই চায়নি একটি ফিলিস্তিনী আরব রাষ্ট্র গঠিত হোক, যদিও ১৯৪৭ সালে প্রণীত জাতিসংঘের এক সিদ্ধান্তে এই রাষ্ট্র গঠনের বিধান রাখা হয়। তাই, ১৯৪৯ সালে আরব প্যালেস্টাইনকে ইসরায়েল ও ট্রান্স-জর্দান এই দুই-ভাগে বিভক্ত করার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ও ইসরায়েলের প্রথম প্রধান মন্ত্রী বেন গুরিয়ন যে মতৈক্যে উপনীত হন তাকে সন্তোষের সাথে স্বাগত জানানো হয়, বিশেষ করে ব্রিটেন থেকে। এই মতৈক্য অন্যান্য আরব দেশের সাথে ট্রান্স-জর্দানের (জর্দান নদীর পশ্চিম তীর জবরদখলের পর থেকে ট্রান্স-জর্দান জর্দান নামে অভিহিত হয়ে আসছে) সম্পর্ককে খারাপ করে তোলে। ফলে, আরব ও মুসলমানদের সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৫৫ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৫৬ সালের গোড়াতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিপুল মর্যাদার অধিকারী মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল

আবদেল নাসের তাঁর দেশের প্রতিরক্ষার প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী খবরদারী মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে সকল বাহিনী উঠিয়ে নিতে ব্রিটিশদের বাধ্য করেন। তিনি আলজিরিয়ার জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করেন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্টতর সম্পর্ক গড়ে তোলার নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে লণ্ডন ও প্যারিস মিশরকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাশ্চাত্যের অভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপের মুখে প্রেসিডেণ্ট নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করার কথা ঘোষণা করেন, এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের শাসকচক্র মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সক্রিয় প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে।

এই উদ্দেশ্যে তারা ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরায়েলের ইহুদিবাদী শাসকচক্রের সাথে মিসরের ওপর ত্রিপক্ষীয় আগ্রাসন চালানের ব্যাপারে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইসরায়েলী সম্প্রসারণবাদীরা সিনাই উপদ্বীপ, গোলান পাহাড়শ্রেণী ও জর্দান নদীর উত্তর তীর দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা আঁটে। তারা এই অঞ্চলে আরব ও মুসলমানদের ঐক্যের দুর্গ--নাসেরের প্রগতিশীল শাসন নস্যাৎ করতে চায়। পশ্চিম ইউরোপের নয়া-উপনিবেশবাদীদের আর ইহুদিবাদী আগ্রাসকদের স্বার্থ এক হয়ে ওঠে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহুদিবাদী আগ্রাসকরাই মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী-ইসরায়েলী যুদ্ধের সূচনা ঘটায়। ১৯৫৬ সালের ২৯শে অক্টোবর ইসরায়েলী বাহিনী সিনাই উপদ্বীপ আক্রমণ করলে এই যুদ্ধ শুরু হয়। তারপর, নভেম্বরের ৫ তারিখে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী পোর্ট সৈয়দে অবতরণ করে।

মিসরীয় বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ, মরক্কো থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী সংহতি আন্দোলন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ কর্তৃক এই ত্রিপক্ষীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণের ফলে ইঙ্গ-ফরাসী-ইসরায়েলী আগ্রাসন ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ ও ফরাসীরা বাধ্য হয় মিসরের ভূখন্ড থেকে সৈন্য অপসারণ করতে। এই ব্যর্থতার কারণে এ্যান্থনি ইডেনের নেতৃত্বাধীন ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারের পতন ঘটে। ইসরায়েলকেও সিনাই উপদ্বীপ থেকে সরে যেতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সে সময় কি ছিল? উল্লেখ্য যে, এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র ঐ যুদ্ধে তাদেরও যে একটা ভূমিকা ছিল সেটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। শুধু তাই নয়, তারা এটাও

প্রতিভাত করার চেষ্টা করে থাকে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় ভূমিকা নয়, হোয়াইট হাউজের "শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ" গ্রহণের ফলেই ঐ যুদ্ধ থেমেছিল। যাই বলা হোক না কেন, ত্রিপক্ষীয় আগ্রাসনের পেছনে যে ওয়াশিংটনেরও হাত ছিল সেটা এক তর্কাতীত সত্য। হোয়াইট হাউজ "শান্তি" স্থাপনের ভাব দেখিয়েছিল এই আশায় যে যুদ্ধ পুরনো ঔপনিবেশিক প্রধান দুই শক্তি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে দুর্বল করবে, ফলে রক্ষণশীল আরব দেশসমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ এসে যাবে মার্কিন একচেটিয়াদের হাতে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে ঘোষিত আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের এটাই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য।

যাই হোক, আরব প্রাচ্যের ঘটনাবলী ওয়াশিংটন রচিত চিত্রনাট্য ধরে অগ্রসর হয়নি।

১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে জাতীয় সনদ প্রণয়নের পর মিশরের সামন্তবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব সামাজিক বিপ্লবের রূপ নেয়। ১৯৬১ সালে কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৬২ সালে ঘটে ইয়েমেনে বিপ্লব। ১৯৬২ সালের ৩রা জুলাই ফ্রান্স বাধ্য হয় আলজিরিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আরব প্রাচ্য ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশবাদী খবরদারী ও নয়া-উপনিবেশবাদী আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন প্রত্যাখ্যান করে।

এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকমহল খোলাখুলিভাবে ইসরায়েলের উপর ভর করে। ইসরায়েলের বিমান বাহিনী সজ্জিত ছিল ফ্রান্সের মিরেজ বোমারু বিমানে। পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের অর্থে ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনীর বিমান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা হয়। ব্রিটিশ ট্যাঙ্কসজ্জিত কয়েকটি আর্মার্ড ডিভিশনও ছিল ইসরায়েলের। মার্কিন শাসকমহল আশা করেছিল, মিশর ও সিরিয়াকে পরাস্ত করতে, নাসেরের শাসন উৎখাত করতে এবং এইভাবে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার অরো একটি নতুন ঘাঁটি স্থাপন করতে ইসরায়েল সক্ষম হবে। এর আগে, ১৯৫৩ সালের আগস্টে সি. আই. এ.র যোগসাজশে সংঘটিত এক প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এধরনের প্রথম ঘাঁটি স্থাপন করা হয় মুসলিম ইরানে।

ইহুদিবাদীরা স্বেচ্ছায় তাদের আর এক পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেবায় এভাবেই নিয়োজিত হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ,

এটা তাদের প্রধান লক্ষ্য, "বৃহত্তর ইসরায়েল" গঠনের লক্ষ্যকে অগ্রসর করে নেয়। তারা মধ্যপ্রাচ্যে আর একটি আগ্রাসন পরিচালনার সক্রিয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এ থেকেই আগ্রাসী সামরিক রাজনৈতিক জোট, ওয়াশিংটন তেলআবিব জোটের সূত্রপাত।

তৃতীয় আরব ইসরায়েল যুদ্ধে, মার্কিন পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে পরিচালিত ১৯৬৭ সালের জুন মাসের "ঝটিকা আক্রমণ," তেলআবিব বড়ো রকমের সামরিক বিজয় লভে করে। যুদ্ধ ঘোষণা না করে, হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে ইহুদিবাদীরা মিসর, সিরিয়া ও জর্দানের বাহিনীকে পরাভূত করে সিনাই উপদ্বীপ, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে তারা সি. আই. এ. কর্তৃক সরবরাহকৃত আরব দেশসমূহের পরিস্থিতি সম্পর্কিত গোয়েন্দা রিপোর্ট পুরোপুরি কাজে লাগায়। তাছাড়া ইসরায়েল আরব দেশসমূহের পাশ্চাত্যপন্থী মহলকে উৎকোচ প্রদান ও নানাবিধ ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে, তারা মার্কিন শাসকমহল কর্তৃক অর্পিত প্রধান কর্তব্য সম্পাদনে, অর্থাৎ নাসেরকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়।

ইসরায়েলের আগ্রাসন সারা মুসলিম বিশ্বে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে, আগ্রাসকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে এবং মার্কিন দালালদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এর পাশাপাশি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সর্বতোমুখী রাজনৈতিক কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য মিশর ও সিরিয়ার প্রগতিশীল সরকারসমূহকে রক্ষা ও জোরদার করে। এই সাহায্য তাদের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য ও আরব প্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতি জোরদার করে।

মিশর, সিরিয়া, জর্দান ও প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের ৬০ হাজার বর্গ-কিলোমিটার ভূখণ্ড দখলের পর ইসরায়েলী আগ্রাসকরা দখলকৃত এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করা শুরু করে। তারা দখলকৃত এলাকায় বর্বর বর্ণবাদী শাসন কায়েম করে। যেকোনো ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তারা নির্মম হাতে দমন করে। এই অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা এবং সাধারণভাবে ইসলামিক সাংস্কৃতিক বিকাশ এর ফলে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়।

ফিলিস্তিনী দেশপ্রেমিকদের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ, আরব দেশসমূহ ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিরোধিতা, বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন প্রস্তাব উপেক্ষা করে তেল আবিব এখনো

পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে দখলকৃত আরব ভূখন্ড জবরদখল করে রেখেছে। কিভাবে ?

প্রথম, ইসরায়েলের উদ্ধত ইহুদিবাদী শাসকরা আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মরীতি ও সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের দাবিকে পদদলিত করার পথ বেছে নিয়েছে।

দ্বিতীয়, মার্কিন সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স, পেন্টাগন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকমহল এশিয়া ও আফ্রিকার সীমান্তে, সুয়েজ খাল, পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে ইহুদিবাদীদের বিপুল প্রধান্যকে নিজেদের জন্যে সুবিধাজনক বলে মনে করে। ওয়াশিংটনের কর্মকর্তারা বিশ্বাস করে যে ইসরায়েলের আগ্রাসন আরব দেশসমূহের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে খারাপ করবে এবং যেসব আরব দেশের ভূখন্ড ইসরায়েল দখল করেছে তাদের সাথে অন্যান্য আরব দেশের সম্পর্কের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে। ওয়াশিংটন আরো মনে করে যে এটা আরব ও মুসলমানদের ঐক্যকে নস্যাৎ করবে, আরব প্রাচ্যের প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল খাড়া করবে এবং এই অঞ্চলে মার্কিন অবস্থান জোরদার করতে সহায়তা করবে।

ওয়াশিংটন তাই প্রতি বছর আরো বেশি বেশি করে তেল আবিবকে সমর্থন করছে। তবে, ইহুদিবাদী আগ্রাসকদের পেছনে অতীত ও বর্তমান মার্কিন সমর্থনের এটাই একমাত্র কারণ নয়। ঘটনা হলো, ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে ও ১৯৭০-এর দশকের গোড়াতে ইসরায়েলের কূটনীতিবিদগণ, সশস্ত্র বাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগ মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদীদের নানাভাবে কাজ করে দেয়। তারা এশিয়া ও আফ্রিকার প্রগতিশীল দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে, উষ্ণমন্ডলীয় আফ্রিকা ও উত্তর আফ্রিকার মধ্যে বিরোধ উস্কে দেয়, এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে মদদ জোগায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিক্রিয়াশীল হাইলে সেলাসীর সাথে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইহুদিবাদীরা ইথিওপিয়ার জন্যে বহুসংখ্যক সামরিক পাইলটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ইথিওপিয়ার একাধিক বিমান ঘাঁটির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এর ফলে ইথিওপিয়া ও তার মুসলিম প্রতিবেশীদের মধ্যে, মিশর ও সুদানের মধ্যে সম্পর্ক খারাপের দিকে মোড় নেয়। এটা এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে মার্কিন কূটনীতিবিদরে তৎপরতার ব্যাপক সুযোগ করে দেয়।

ইসরায়েলের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে হাইলে সেলাসী ১৯৬০-এর দশকের

শেষ দিকে ইথিওপিয়ার ১০ হাজার ফালাশাকে (ইথিওপীয় ইহুদি) স্ট্রাটেজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ লোহিত সাগরের দক্ষিণ অংশের দালাক দ্বীপমালায়, বাব এল মানদেব প্রণালীর প্রবেশমুখে, পুনর্বাসনের নির্দেশ দেয়। ইহুদিবাদীরা এই দ্বীপমালাকে শুধু তাদের গোপন নৌঘাঁটি হিসেবেই ব্যবহার করে না, ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্রে গোপন অস্ত্র চালানের কেন্দ্র হিসেবেও কাজে লাগায়। ইয়েমেনের ইহুদিদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ইসরায়েলের গোয়েন্দারা এখনো এসব অস্ত্র ব্যবহার করে ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাধানোর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এসব অস্ত্র দেয়া হয় বিদ্রোহী যাযাবর দলনেতাদের হাতে, ন্যায়সঙ্গত সানা সরকারকে উৎখাতে প্ররোচিত করে। যাযাবর দলনেতারা সৌদি আরবের সমর্থন পাচ্ছে।

বহু বছর ধরে ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা সাভাক ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা, বিশেষ করে মোসাদ-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সি. আই. এ. এই সম্পর্ক রক্ষায় ও বাড়িয়ে তোলায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। গোয়েন্দা প্রশিক্ষণের জন্যে দক্ষিণ-পূর্ব ইরানে বিশেষ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। আরব দেশসমূহ থেকে আগত ইহুদিদের রিক্রুট করে মোসাদ তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম দেশসমূহে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালানের জন্যে নিয়োগ করে। ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে ইরানের শাহ-এর অনুমোদনক্রমে ইসরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগ ইরানের কুর্দিশ আন্দোলনের রক্ষণশীল অংশ ও ইরাক সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইরানের কুর্দিস্তানের মধ্য দিয়ে ইরাকের কুর্দিস্তানে নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এর ফলে ইরাকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে এবং তাই ইরাকের পক্ষে ইসরায়েলী আগ্রাসন প্রতিরোধে প্রতিবেশী আরব দেশগুলোকে সাহায্য করার সুযোগ কমে যায়। একই সাথে, এর ফলে ইরাক শাতিল আরব বরাবর ইরাক-ইরান সীমান্তরেখা প্রতিষ্ঠায় ইরানের সাথে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। আর এসবই, চূড়ান্ত বিচারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক মহলের স্বার্থেই যায়।

ইহুদিবাদীরা জায়ারেতেও অনেক "কাজ" করে। কয়েক বছর ধরে তারাই ছিল জায়ারের ছত্রীসেনা প্রশিক্ষণদানের দায়িত্বে। এই ছত্রী-সেনারাই দুই দুইবার — ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে ও ফ্রান্সের অনুমোদনক্রমে শাদে অভিযান চালায়। শাদে এই ছত্রীসেনারাই মুসলিম জনগণ সমর্থিত গুকুনি উদ্দেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইহুদিবাদীরা শাদে গৃহযুদ্ধে ইন্ধন

জোগানো শুরু করে। এর ফলে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে, লিবিয়ার সাথে সুদান ও মিশরের সম্পর্ক খারাপ হয় এবং একাধিক মুসলিম দেশের দৃষ্টি ইসরায়েলের লেবানন আক্রমণ থেকে অন্যত্র সরে যায়।

১৯৬৭ সালে দখলকৃত ভূখন্ডের সম্পদ শোষণ, জাতিসংঘ সিদ্ধান্তের অবমাননা ও প্রতিবেশী আরব দেশসমূহের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক আগ্রাসী তৎপরতার ফলে সংঘটিত হয় ১৯৭৩ সালের চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের এবং অক্টোবর ১৯৭৩ সালের শেষভাগে মিশর-ইসরায়েল রণাঙ্গনে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে আসে। ওয়াশিংটন বিবদমান দেশসমূহের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা নেয় জোর করে। এই সুযোগে সে বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের সাথে, বিশেষ করে মিশরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ইসরায়েলী আগ্রাসকদের নিঃশর্ত সমর্থনদানের কারণে এসব দেশের সাথে ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

এ সময়েই শুরু হয় কিসিঞ্জারের "ঝটিকা" কূটনীতি। এরই পরিণতিতে গড়ে ওঠে কুখ্যাত ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা।

মিশরকে ইসরায়েলের সাথে ১৯৭৯ সালে আলাদাভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল সৌদি আরব ও জর্দানকে দিয়ে ঐ চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিয়ে সে লেবাননকে, বিশেষ করে সিরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এর মাধ্যমে এবং ইরান ও পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বের সমগ্র মুসলিম দেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারের অবস্থায় চলে যেতে পারবে আশা করেছিল।

আফগানিস্তানে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল বিপ্লব ও ১৯৭৯ সালের ইরানের বিপ্লব ভিন্ন দুই প্রকৃতির রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক সংঘটিত হলেও এই দুই বিপ্লবই চরমভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। এই দুই বিপ্লব মুসলিম বিশ্বে মার্কিন অবস্থানের ওপর তীব্র আঘাত হানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এক বিশাল সামরিক ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলা ইরান তার হাতছাড়া হয়ে যায়। এই দুই বিপ্লব অন্যান্য মুসলিম দেশকেও প্রভাবিত করে। আর তাই রক্ষণশীল আরব দেশগুলোও ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিকে সমর্থন প্রদানে ভয় পায়। বিপ্লবের প্রভাবের আর এক অভিপ্রকাশ ঘটে ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সৌদি আরবে সরকারবিরোধী তৎপরতার মধ্য দিয়ে। ঐ সময়

বিদ্রোহীরা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় স্থান, মক্কার আল হারম মসজিদ কয়েকদিনের জন্যে দখল করে নেয়। সরকারী বাহিনী ডিসেম্বরের শুরুর দিকে ফ্রান্স থেকে গেরিলা-বিরোধী ট্রুপ নিয়ে এসে বিদ্রোহীদের মসজিদ থেকে বিতাড়ন করে। ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে মক্কায় সংঘটিত এই ঘটনায় পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মতো মুসলিম দেশ-সমূহেও মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়।

দেখতে দেখতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্প ডেভিড নীতি মুখ থুবড়ে পড়ছে। অপরদিকে, ইসরায়েলের ইহুদিবাদী নীতি শুধু ব্যাপক বিশ্ব জনমতের কাছেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটো মিত্র দেশসমূহের কাছেও তীব্র নিন্দার বিষয় ওঠে। মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত মার্কিন নীতির ব্যর্থতা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ ইহুদী ইসরায়েলের বিচ্ছিন্নতা দিন দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকতে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে পরিচালিত হয় লেবাননের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আগ্রাসন। এই আগ্রাসনের উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থাকে নির্মূল করা এবং দক্ষিণ লেবানন দখল করা (এই স্বপ্ন ইহুদিবাদীরা দেখে আসছে এ শতাব্দীর শুরু থেকে)। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহুদিবাদীদের লেবানন আগ্রাসন পরিচালিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭০-এর দশকে যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়েছিল সেটাই নতুন করে পূরণ করার তাগিদে। ওয়াশিংটনের সমর-বিশারদরা হিসেব করেছিল, সর্বাধুনিক মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইসরায়েল-বাহিনীর লেবানন আক্রমণ ফিলিস্তিন প্রতিরোধ আন্দোলনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে এবং আরব লীগ ও ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা দুটোকেই ভন্ডুল করে দেবে।

এটা কোন কাকতলীয় ঘটনা নয় যে ১৯৮২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইসরায়েলী আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর পর দিয়েই প্রেসিডেন্ট রেগান তাঁর কুখ্যাত "মধ্যপ্রাচ্য শান্তি উদ্যোগ" নিয়ে এগিয়ে আসেন। এটা ছিল আরব লীগকে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ট্রয়ের ঘোড়া উপহার দেয়ার সামিল।

ওয়াশিংটন ও তেল আবিব ভেবেছিল সৌদি আরব ও জর্দান শেষ পর্যন্ত "মধ্যপ্রাচ্য শান্তি উদ্যোগ" সমর্থন করবে এবং এর ফলে সিরিয়া ও লিবিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তারা ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে লেবাননের দক্ষিণপন্থী খ্রীস্টান রাজনৈতিক ও সামরিক গ্রুপের সাথে প্রকাশ্যে ও গোপনে ইহুদিবাদীদের সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, তারা আশা করেছিল, এই নীতি লেবাননে ইসরায়েলী আগ্রাসকদের অবস্থা ভাল করবে এবং একই সাথে লেবাননের মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে পার্থক্য বাড়াবে। এইসব ঘটনা ফ্রান্সকেও লেবাননের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়।

লেবাননের সংকটের পেছনের প্রকৃত উৎস অনুধাবন করতে হলে এটা দেখতে হবে যে এই সংকট ও অন্য কয়েকটি ঘটনা, যেমন উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি (পশ্চিম সাহারাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যার কারণে) ও শাদে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের ঘটনা যে একই সময়ে বা সামান্য কিছু আগে-পরে দিয়ে ঘটলো সেটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার নয়। উল্লেখ্য যে, লেবানন সংকটের সাথে সাথেই লিবিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসী তৎপরতা জোরদার করা হয়, মিশর, সুদান ও ওমানে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়, ইরাক-ইরান যুদ্ধ আরো দীর্ঘায়িত করার মার্কিন ও ইসরায়েল গোয়েন্দা সংস্থার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ বেড়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক আফগান প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওয়াশিংটন ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তেজনাকর করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সবশেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সময়টাকেই বেছে নেয় **সেন্ট্রাল কমান্ড** গঠনের উপযুক্ত সময় হিসেবে। এই সেন্ট্রাল কমান্ডের আওতায় আছে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার ১৯টি দেশ, যার মধ্যে ১৮টিই মুসলিম দেশ।

এসব ঘটনা এটাই তুলে ধরে যে আরব দেশসমূহের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আগ্রাসী যুদ্ধসমূহ, বিশেষ করে লেবাননের বিরুদ্ধে পরিচালিত পঞ্চম হামলা, প্রকৃত প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অনুসৃত সাম্রাজ্যিক নীতিরই আনুসঙ্গিক পরিণতি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম প্রাচ্যের দেশসমূহ সহ সারা বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব কায়েমের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এ কারণেই, হোয়াইট হাউজে কোন্ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে না আছে সেটা কোনো ব্যাপারই নয়, ইহুদিবাদী আগ্রাসকের প্রতি ওয়াশিংটনের সমর্থন দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম প্রাচ্যের শত্রু-মিত্র

ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বের ১৪শ বছরের মধ্যে ৯শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলমানরা বাধ্য হয়েছে আগ্রাসন, আক্রমণ আর হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতে। ক্রুসেডের সময় পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত প্রভুরা ও পরবর্তীতে বণিক সম্প্রদায় ও ক্রমবর্ধমান শিল্পপুঁজি মুসলমানদের ওপর বারবার আক্রমণ পরিচালনা করেছে। এখন তাদের দায়িত্ব নিয়েছে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া কারবার ও সমর-শিল্প কমপ্লেক্স। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী একের পর এক পরিচালিত এসব আক্রমণ ও আগ্রাসনের পরিণতিতে মুসলিম দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এবং মুসলমানদের জীবনে নেমে এসেছে অশেষ দুর্দশা আর দুর্ভোগ। অংকশাস্ত্র, ভূগোল, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে নানাবিধ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে ও শিল্প-সাহিত্যে অবিস্মরণীয় সৃজনশীলতা দিয়ে যে মুসলিম সভ্যতা একদা মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করেছে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে এইসব বিদেশী হামলা ও আক্রমণের ফলে।

জাতিসংঘের শ্রেণীভাগ অনুযায়ী অধিকাংশ মুসলিম দেশই "অনুন্নত" শ্রেণীতে পড়ে। অবশ্য ১৯৬০-এর দশকে এসব দেশের গায়ে "উন্নয়নশীল দেশ"-এর লেবেল আঁটা হয়।

এই বইয়ে বর্ণিত ঘটনাবলী ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলপত্রের মূল্যায়ন এটাই তুলে ধরে যে মুসলিম দেশসমূহের অনুন্নত অবস্থার জন্য পাশ্চাত্যের শক্তিসমূহের লুণ্ঠণাত্মক হামলা ও আগ্রাসনই মূলত দায়ী। এই শতাব্দীর গোড়াতে, তারা ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল মুসলিম দেশকেই

তাদের উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশে পরিণত করে। পাশ্চাত্যের শক্তিসমূহ ক্ষুধা আর অমানবিক শোষণে মৃত কোটি কোটি মুসলমানের শবদেহের ওপর তাদের সমৃদ্ধি অর্জন করে এবং অর্থনীতিকে বিকশিত করে।

যেহেতু বেশিরভাগ মুসলিম দেশই দরিদ্র (শুধু কয়েকটি তৈলসমৃদ্ধ দেশ বাদে), তাই এসব দেশ নানাবিধ তীব্র সামাজিক বিরোধ, মতপার্থক্য ও অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। এটা এসব দেশের ইতিহাসে ও বিকাশে উপনিবেশবাদ যে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বারবার।

সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সামান্যতম সুযোগও কখনো হাতছাড়া করেনি। তারা প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন ফস্টার ডালেসের "এশিয়ানরা এশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক" উক্তিকে "মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক" এই নতুন বাক্যে সংশোধন করে নিয়েছে। মার্কিন কূটনীতি ১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময়ে পাক-আফগান সম্পর্ককে বিরোধের শেষ পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে পাকিস্তান আফগান ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে পাকিস্তানের বন্দর-সুবিধা বন্ধ করে দেয় এবং পরিণতিতে আফগানিস্তানের অর্থনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা লেখে যে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি মধ্যপ্রাচ্যে ও সামগ্রিকভাবে এশিয়ায় মার্কিন পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবে।

ঐ সময়ে আফগানিস্তানে সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্মরত মরিসন-নুদসেন কোম্পানিকে মার্কিন শাসকচক্র এমনভাবে খাল খননের নির্দেশ দেয় যাতে ইরান গিলমান্দ নদীর জলপ্রবাহ থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে আফগানিস্তান ও ইরানের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়।

৩০ বছর আগে, ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগস্ট সি. আই. এ-র ষড়যন্ত্রে ইরানে প্রতিষ্ঠিত হয় শাহ-এর একনায়কতন্ত্র। ফলে ইরান মুসলিম প্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দোসরে পরিণত হয়। এই ঘটনা বিশ্বে সর্বজনবিদিত। তবে খুব কম লোকই জানেন যে ১৯৮২-১৯৮৩ সালে হোয়াইট হাউজের প্রত্যক্ষ নির্দেশে সি. আই. এ. পাকিস্তান ও তুরস্কে প্রতিবিপ্লবী ইরানী সংগঠন গড়ে তোলে।

"মুসলমান" বিষয়ক মার্কিন নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা উত্তেজনার সুযোগ

নেয়া। এছাড়া, লেবাননের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, লেবাননকে দ্বিখণ্ডিত করার ইহুদিবাদী ষড়যন্ত্র ইত্যাদি থেকে মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরানোর জন্যেও সাম্রাজ্যবাদীরা আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি জটিল করে তুলছে। তারা চায় না মুসলমানরা মার্কিন-ইসরায়েল সামরিক রাজনৈতিক মৈত্রীর আগ্রাসী প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারুক।

এখন এসব কথার সার-সংক্ষেপ করা যাক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শত শত সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে মুসলিম বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে। সে দ্রুত মোতায়েনক্ষম বাহিনীকে সক্রিয় করে তুলেছে। যেমন, লেবাননে এই বাহিনী একাধিকবার স্থানীয় মুসলমানদের ওপর তার সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছে। মার্কিন শাসকচক্র অনুসৃত "মুসলিম" বিষয়ক নীতির বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে আসে যে এই নীতি মুসলিম দেশসমূহ, বিশেষ করে প্রগতিশীল মুসলিম দেশসমূহের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে 'মুসলিম' দেশগুলোই। আর এ কথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও গোপন করে না।

এটাও উল্লেখ করা উচিত যে, ওয়াশিংটনের ন্যাটোভুক্ত কিছু মিত্র দেশও মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একইভাবে বারবার হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

মুসলিম দেশসমূহের বিরুদ্ধে অনুসৃত মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের নীতি সব সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করেছে এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। তাছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন একাধিক মুসলিম দেশকে, বিশেষ করে প্রগতিশীল মুসলিম দেশকে উপনিবেশবাদের অবশেষ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ওয়াশিংটন ও তার মিত্র দেশসমূহের সম্প্রসারণবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মিত্র হিসেবে গণ্য করেছে ও করছে। সমতার ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্র ও জাতির সাথে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ককে অগ্রসর করে নিতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সবসময় যেসব দেশ নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, যারা প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমাজ প্রগতির জন্য বৃহত্তর সহযোগিতার পথ অনুসরণ করছে তাদের পাশে প্রকৃত বন্ধুর মতো এসে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় তাদের পাশে রয়েছে ও থাকবে।

উল্লেখ্য যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লেনিন তাঁর মার্কসবাদ নিয়ে ক্যারিকেচার ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবাদ শীর্ষক প্রখ্যাত রচনায় প্রাচ্যের দেশ ও জাতিসমূহের সাথে মৈত্রী সম্পর্কিত ধারণা সর্বপ্রথম উপস্থিত করেন। লেনিন এই বিষয়টাকে ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরও বার বার উত্থাপন করেন। রূপকার্থে বলতে গেলে, তিনিই সোভিয়েত সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও চালু মুসলিম প্রাচ্যের শত শত শিল্প ও অন্যান্য প্রকল্পের বনিয়াদ গড়ে দিয়ে যান। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্যে ও সহায়তায় স্থাপিত হয়েছে মিশরের আসওয়ান বাঁধ ও হেলওয়ান ধাতু কারখানা, সিরিয়ার জলপ্রকৌশল প্রকল্প, তুরস্কের আরপা-চাই নদীর বাঁধ, ইরাকের উত্তর রুমেইলা তৈল উত্তোলন কমপ্লেক্স, ইরানের ইস্পাহানের ধাতু প্রকল্প, আফগানিস্তের ট্রান্স-হিন্দুকুশ হাইওয়ে ও পাকিস্তানের গুডড্ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

মুসলিম দেশসমূহের সাথে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের রেকর্ডটা এবার পর্যালোচনা করা যাক।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সোভিয়েট রাষ্ট্র মস্কোতে তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানের সাথে মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করে। কোনো মুসলিম দেশের জন্যে এই চুক্তিই হলো প্রথম সমতাভিত্তিক আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই চুক্তিগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এসব দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বহুলাংশে নির্ধারণ করেছে। একই সাথে সোভিয়েত কূটনীতিবিদগণ মস্কোতে আফগানিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তিতে মধ্যস্থতা করে। পরে তেহরানে সোভিয়েত কূটনীতিবিদদের মধ্যস্থতায় অনুরূপ আর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আফগানিস্তান ও পারস্যের মধ্যে।

১৯২১ সালে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক যখন বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে (বিদেশী শক্তিকে লেলিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ) সংগ্রাম করছিল তখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সামরিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য মুসলিম তুরস্ককে তার স্বাধীনতা রক্ষায় সক্ষম করে তোলে।

১৯১৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়া তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সময় এবং পরে, ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক উস্কে দেয়া খোস্ত-এর বিদ্রোহ দমনে আফগানিস্তানের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

১৯১৮ সালে ব্রিটিশ এজেন্টরা পারস্য ও আফগানিস্তানের মধ্যে এবং ১৯২৫ সালে পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে বিরোধ উস্কে দেয়ার ষড়যন্ত্র

চালায়। উভয় ক্ষেত্রেই সোভিয়েত কূটনীতিক তৎপরতায় ঐ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

১৯২৪ সালে বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন মিশর ও সুদানের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন দমনে নির্যাতন বৃদ্ধি করে তখন সোভিয়েত জনগণ মিশর ও সুদানের জনগণের পক্ষে দাঁড়ায়। বাকুতে গঠিত হয় "মিশর থেকে হাত গুটাও" কমিটি। সোভিয়েত মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রসমূহে অনুরূপ বহু কমিটি গঠন করা হয়।

একই বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হেজাজ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং জিদ্দায় আরব প্রাচ্যের প্রথম সোভিয়েত কূটনৈতিক অফিস খোলা হয়। ১৯২৬ সালে হেজাজ ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হলে (যা পরবর্তীতে সৌদি আরব নামে অভিহিত হয়) সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম এই নবগঠিত রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, সৌদি আরবের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী, সৌদি আরবের ভবিষ্যৎ বাদশাহ, ফয়সল ১৯৩২ সালে মস্কো সফরের সময় বলেছিলেন ঃ

"আমি সৌদী আরবের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে সফরে আসতে পেরে সত্যি খুবই খুশী হয়েছি।"

আগেই বলা হয়েছে, হিটলার ও তার জেনারেলরা কুখ্যাত বারবারোসা পরিকল্পনা (এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর হামলা চালানোর অভিসন্ধিতে) তৈরি করে তখন তারা চিন্তা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাস্ত করে ট্রান্স-ককেশিয়া হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে উপনীত হতে। তারা চেয়েছিল, বাগদাদ ও তেহরান দখলের পর বুলগেরিয়া থেকে তুরস্ক হয়ে এবং লিবিয়া থেকে মিশর ও প্যালেস্টাইন হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে প্যানজার ডিভিশন পাঠাতে। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে হিটলার বাহিনীর পতনের পরই কেবল মুসলিম প্রাচ্যের দেশসমূহের উপর থেকে এই হুমকি দূর হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রগতিশীল শাসনাধীন একাধিক মুসলিম দেশকে সর্বাত্মক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করে। আরব দেশসমূহের মুসলমানরা জানেন যে সোভিয়েত সরকারের দৃঢ় ভূমিকার কারণেই ১৯৫৬ সালের নভেম্বরে বিটিশ ও ফরাসী আক্রমণকারীরা মিশর থেকে সৈন্য অপসারণ করতে বাধ্য হয়। এটাও সর্বজনবিদিত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের

ভূমিকার কারণেই চতুর্থ আরব ইসরায়েল যুদ্ধের সময় 'থার্ড ইজিপশিয়ান আর্মি' ইসরায়েলী আগ্রাসকদের কাছে অবরুদ্ধ হয়ে নির্মূল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

ইরানের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ১৯২১ সালে সম্পাদিত সোভিয়েত-পারস্য চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯২০-এর দশকের শুরুর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানকে ব্রিটিশ দখলদারীদের কবল থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। এবং ১৯৪১-১৯৪২ সালে হিটলারের আক্রমণ থেকে ও ১৯৭৮ সালে মার্কিন হস্তক্ষেপ থেকে ইরানকে সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষা করে।

আফগানিস্তানের ইতিহাসে ও আফগান জনগণের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে সোভিয়েত-আফগান বন্ধুত্ব এক বিশেষ অনুকূল ভূমিকা পালন করেছে। সোভিয়েত-আফগান মৈত্রীর কারণেই আফগানিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করতে ও তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

১৯৭৮ সালের সউর (এপ্রিল) বিপ্লব লক্ষ লক্ষ আফগানবাসীর জীবনে শুধু নতুন যুগেরই সূচনা করেনি, এটাও প্রমাণ করেছে যে মুসলিম দেশসমূহের জনগণের পক্ষে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। সম্ভব মার্কিন শাসকচক্রের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেয়া। এই বিপ্লবে ওয়াশিংটন খুশী হতে পারেনি; তাই সে সাথে সাথে হস্তক্ষেপ করার ও আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা শুরু করে। ঐ পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৭৮ সালের ৫ই ডিসেম্বরে 'মৈত্রী সৎপ্রতিবেশী ও সহযোগিতা চুক্তি' সম্পাদন করে। এর এক বছর পর, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ কর্তৃক আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী গ্রুপ পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ তীব্রতর করা হলে, আফগানিস্তানের আইনানুগ সরকার উপরোক্ত চুক্তির ৪ নং ধারা বলে এবং জাতিসঙ্ঘ সনদের ৫১ নং ধারার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আফগানিস্তানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সীমিত সংখ্যক সোভিয়েত 'সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে সহায়তা করার আবেদন জানায়।

আন্তর্জাতিক দায়িত্বের প্রতি এবং মুসলিম প্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্বের নীতিমালার প্রতি একনিষ্ঠ সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ আবেদনে স্বাভাবিকভাবেই সাড়া দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও এতদঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদকে

সমর্থনকারী দেশগুলোর অঘোষিত যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সংগে সংগেই সোভিয়েত সৈনিকদের প্রত্যাহার করা হবে।

তারপর প্রায় পাঁচ বছর পার হয়েছে। কিন্তু সীমিত সংখ্যক সোভিয়েত সৈন্য এখনো আফগানিস্তানে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে, কারণ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসী তৎপরতা বন্ধ করা দূরের কথা, ন্যাটো দেশসমূহ ও বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র তা দিন দিন আরো বাড়িয়েই চলেছে। আমরা যেমন আগেই উল্লেখ করেছি; তাদের এই আগ্রাসী তৎপরতার উদ্দেশ্য হচ্ছে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক মুসলিম বিশ্বে বিভেদ ও সংঘর্ষ সৃষ্টির এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ককে খারাপ করে তোলার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহের সাথেও শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নীতি অনুসরণ করে আসছে। ১৯৪৬-১৯৪৯ সালে ওলন্দাজ ও বৃটিশ হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের সমর্থন-দানে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভাব্য সবকিছু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষ নিরসনের জন্যেও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। পাকিস্তান ও ভারত ১৯৬৬ সালের ১২ই জানুয়ারি, বহুলাংশে সোভিয়েত কূটনৈতিক সহায়তার সাফল্যে, যুদ্ধবিরতি ও বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তাশখন্দ ঘোষণা স্বাক্ষর করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বীরত্বপূর্ণ আরব জনগণ, ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থা ও ইহুদিবাদী আগ্রাসনের শিকার অন্যান্য দেশকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখেনি। সে এই অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮২ সালে ফেজ শহরে অনুষ্ঠিত আরব শীর্ষ সম্মেলনে এ সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানায়।

উপসংহারে বলা যায়, যেক্ষেত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপনিবেশবাদীরা ও সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদের মারাত্মক শত্রু হিসেবে বিরাজ করেছে ও করছে, সেক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় মুসলিম প্রাচ্যের দেশসমূহের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে তাদের পাশে থেকেছে এবং রয়েছে।

———